سورة الفتح

সূরা ফাত্‌হ্

মদীনায় অবতীর্ণ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ① لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ

وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ②

وَيَنصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيزًا ③

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে।

(১) নিশ্চয় আমি আপনার জন্য এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট (২) যাতে আল্লাহ্ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করেন ও আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (৩) এবং আপনাকে দান করেন বলিষ্ঠ সাহায্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আমি (হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে) আপনাকে একটি প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি। অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধির এই ফায়দা হয়েছে যে, এটা একটা আকাঙ্ক্ষিত বিজয় তথা মক্কা বিজয়ের কারণ হয়ে গেছে। এদিক দিয়ে সন্ধিটিই বিজয়ের রূপ পরিগ্রহ করেছে। মক্কা বিজয়কে 'প্রকাশ্য বিজয়' বলার কারণ এই যে, ইসলামী শরীয়তে বিজয়ের উদ্দেশ্য রাজ্য করতলগত হওয়া নয়; বরং ইসলামকে প্রবল করা উদ্দেশ্য। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য বহুলাংশে হাসিল হয়ে যায়। কেননা, আরবের গোত্রসমূহ এই অপেক্ষায় ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর স্বগোত্রের মুকাবিলায় বিজয়ী হলে আমরাও তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নেব। মক্কা বিজিত হলে পর চতুর্দিক থেকে আরবের গোত্রসমূহ আগমন করতে থাকে এবং নিজে অথবা প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। (বুখারী) মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামের বিজয়ের লক্ষণাদি ফুটে উঠে, তাই একে প্রকাশ্য বিজয় বলা হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধি ছিল এই বিজয়ের কারণ ও উপায়। কারণ, মক্কাবাসী-দের সাথে প্রায়ই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণে মুসলমানরা নিজেদের শক্তি ও সমরোপকরণ বৃদ্ধি করার অবকাশ পেত না। হুদায়বিয়ার সন্ধি হওয়ার ফলে মুসলমানরা নির্বিঘ্নে তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। ফলে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুসলমানদের

সংখ্যা বেড়ে যায়। খায়বর বিজয়ের ফলে সমরোপকরণের দিক দিয়ে তারা অপরের উপর চাপ সৃষ্টি করার মত শক্তিশালী হয়ে যায়। এরপর কোরাইশদের পক্ষ থেকে যখন চুক্তি ভঙ্গ করা হল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) দশ হাজার সাহাবী সমভিব্যাহারে মুকাবিলার জন্য রওনা হলেন। মক্কাবাসীরা এতই ভীত হয়ে পড়ল যে, বেশি যুদ্ধও করতে হল না এবং তারা আনুগত্য স্বীকার করে নিল। যুদ্ধ যা হল, তা এতই সামান্য ও সীমাবদ্ধ ছিল যে, মক্কা যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, না সন্ধির মাধ্যমে —এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। মোটকথা, এভাবে হুদায়বিয়ার সন্ধি বিজয়ের কারণ হয়ে গেছে। তাই রূপক অর্থে এই সন্ধিকেই বিজয় বলে দেওয়া হয়েছে, যাতে মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীও আছে। অতঃপর এই বিজয়ের ধর্মীয় ও ইহলৌকিক ফলাফল ও বরকত বর্ণিত হচ্ছে যে, এই বিজয় এ কারণে হয়েছে) যাতে দীন প্রচার ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে (আপনার প্রচেষ্টার ফলে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে, এর ফলে আপনার সওয়াব অনেক বেড়ে যায় এবং অধিক সওয়াব ও নৈকট্যের বরকতে) আল্লাহ্ আপনার সব অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নিয়ামতসমূহ (যেমন নবুওয়ত দান, কোরআন দান, জ্ঞান দান ও কর্মের সওয়াব দান) পূর্ণ করেন, (এভাবে যে, আপনার সওয়াব ও নৈকট্য আরও বৃদ্ধি পাবে। এই দুইটি নিয়ামত পরকাল সম্পর্কিত। আরও দুইটি নিয়ামত ইহলৌকিক আছে। তা এই যে) আপনাকে (নির্বিঘ্নে ধর্মের) সরল পথে পরিচালিত করেন (আপনি সরল পথে চলেন —এটা যদিও পূর্ব থেকে নিশ্চিত ; কিন্তু এতে কাফিরদের পক্ষ থেকে বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করা হত। এখন এই বাধা থাকবে না)। এবং (অপর ইহলৌকিক নিয়ামত এই যে) আল্লাহ্ আপনাকে এমন বিজয় দান করেন, যাতে শক্তিই শক্তি থাকে। [অর্থাৎ যার পর আপনাকে কারো সামনে মাথা নত করতে না হয়। সেমতে তাই হয়েছে। সমস্ত আরব উপদ্বীপ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর করতলগত হয়ে যায়]।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদের মতে সূরা ফাত্হ ষষ্ঠ হিজরীতে অবতীর্ণ হয়, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) ওমরার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে-কিরামকে সাথে নিয়ে মক্কা মোকাররমা তশরীফ নিয়ে যান এবং হেরেমের সন্নিকটে হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করেন। মক্কার কাফিররা তাঁকে মক্কা প্রবেশে বাধা দান করে। অতঃপর তারা এই শর্তে সন্ধি করতে সম্মত হয় যে, এ বছর তিনি মদীনায় ফিরে যাবেন এবং পরবর্তী বছর এই ওমরার কাযা করবেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অনেকেই বিশেষত, হযরত ফারুকে আযম (রা), এ ধরনের সন্ধি করতে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র ইঙ্গিতে এই সন্ধিকে পরিণামে মুসলমানদের জন্য সাফল্যের উপায় মনে করে গ্রহণ করে নেন। সন্ধির বিবরণ পরে বর্ণিত হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ওমরার ইহ্রাম খুলে হুদায়বিয়া থেকে ফেরত রওনা হলেন, তখন পথিমধ্যে এই পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বপ্ন সত্য এবং অবশ্যই বাস্তব রূপ লাভ করবে। কিন্তু তার সময় এখনও হয়নি। পরে মক্কা বিজয়ের সময় এই স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করে। এই সন্ধি প্রকৃতপক্ষে মক্কা বিজয়ের কারণ হয়েছিল। তাই একে 'প্রকাশ্য বিজয়' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ ও অপর কয়েকজন সাহাবী বলেনঃ তোমরা মক্কা বিজয়কে বিজয় বলে থাক ; কিন্তু আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বিজয় মনে করি। হযরত জাবের বলেনঃ আমি হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই বিজয় মনে করি। হযরত বারা ইবনে আযেব বলেনঃ তোমরা মক্কা বিজয়কেই বিজয় মনে কর এবং নিঃসন্দেহে তা বিজয় ; কিন্তু আমরা হুদায়-বিয়ার ঘটনায় 'বয়াতে-রিযওয়ান'কেই আসল বিজয় মনে করি। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা) একটি বৃক্ষের নীচে উপস্থিত চৌদ্দশ সাহাবীর কাছ থেকে জিহাদের শপথ নিয়েছিলেন। এ সূরায় বয়াতের আলোচনাও করা হয়েছে।—(ইবনে-কাসীর)

যখন জানা গেল যে, আলোচ্য সূরাটি হুদায়বিয়ার ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এই ঘটনার অনেক অংশ এই সূরায় উল্লিখিতও হয়েছে, তখন প্রথমে সম্পূর্ণ ঘটনাটি উল্লেখ করা সমীচীন মনে হয়। তফসীরে ইবনে কাসীরে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তফসীরে মাযহারীতে আরও বেশী বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং চৌদ্দ পৃষ্ঠায় এই কাহিনী আদ্যোপান্ত নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কাহিনীতে অনেক মো'জেযা, উপদেশ, শিক্ষণীয়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয় বিধৃত হয়েছে। এখানে কাহিনীর কেবল সেসব অংশ লিখিত হচ্ছে, যেগুলো সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা যে-গুলোর সাথে সূরার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এর ফলে এই কাহিনী সম্পর্কিত আয়াতসমূহের তফসীর বোঝা খুবই সহজ হয়ে যাবে।

হুদায়বিয়ার ঘটনাঃ হুদায়বিয়া মক্কার বাইরে হেরেমের সীমানার সন্নিকটে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। আজকাল এই স্থানটিকে 'শমীসা' বলা হয়। ঘটনাটি এই স্থানেই ঘটে।

প্রথম অংশ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বপ্নঃ আবদ ইবনে হুমায়দ, ইবনে জরীর, বায়হাকী প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী এই ঘটনার এক অংশ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় স্বপ্ন দেখলেন, তিনি সাহাবায়ে-কিরামসহ মক্কায় নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে প্রবেশ করছেন এবং ইহ্রামের কাজ সমাপ্ত করে কেউ কেউ নিয়মানুযায়ী মাথা মুণ্ডন করেছেন, কেউ কেউ চুল কাটিয়েছেন এবং তিনি বায়তুল্লায় প্রবেশ করেছেন ও বায়তুল্লাহ্র চাবি তাঁর হস্তগত হয়েছে। এটা সূরায় বর্ণিত ঘটনার একটা অংশ। পয়গম্বরগণের স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে। তাই স্বপ্নটি যে বাস্তব রূপ লাভ করবে, তা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নে এই ঘটনার কোন সন, তারিখ বা মাস নির্দিষ্ট করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নটি মক্কা বিজয়ের সময় প্রতিফলিত হওয়ার ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সাহাবায়ে-কিরামকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত শোনালেন, তখন তাঁরা সবাই পরম আগ্রহের সাথে মক্কা যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। সাহাবায়ে-কিরামের প্রস্তুতি দেখে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও ইচ্ছা করে ফেললেন। কেননা স্বপ্নে কোন বিশেষ সাল অথবা মাস নির্দিষ্ট ছিল না। কাজেই এই মুহূর্তেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল।—(বয়ানুল কোরআন)

দ্বিতীয় অংশ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহাবায়ে-কিরাম ও মরুবাসী মুসলমানদের সাথে চলার জন্য ডাকা এবং কারো কারো অস্বীকার করাঃ ইবনে সা'দ প্রমুখ বর্ণনা করেন, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে-কিরাম ওমরা পালনের ইচ্ছা করলেন, তখন আশংকা দেখা দিল যে, মক্কার কোরাইশরা সম্ভবত বাধা দিতে পারে এবং প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। তাই তিনি মদীনার নিকটবর্তী গ্রামবাসীদেরকে সাথে চলার জন্য দাওয়াত দিলেন। অনেক

গ্রামবাসী সাথে চলতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল এবং বলল ঃ মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সহচরগণ আমাদেরকে শক্তিশালী কোরাইশদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করতে চায়। তাদের পরিণাম এটাই হবে যে, তারা এই সফর থেকে জীবিত ফিরে আসতে পারবে না।—(মাযহারী)

তৃতীয় অংশ মক্কাভিমুখে যাত্রা ঃ ইমাম আহমদ, বুখারী, আবূ দাউদ, নাসায়ী প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা) রওয়ানা হওয়ার পূর্বে গোসল করে নতুন পোশাক পরিধান করলেন এবং স্বীয় উষ্ট্রী কাসওয়ার পৃষ্ঠে সওয়ার হলেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমাকে সঙ্গে নিলেন এবং তাঁর সাথে মুহাজির, আনসার ও গ্রামবাসী মুসলমানদের একটি বিরাট দল রওয়ানা হল। অধিকাংশ রেওয়ায়েতে তাদের সংখ্যা চৌদ্দশ বর্ণনা করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বপ্নের কারণে এই মুহূর্তেই মক্কা বিজিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাদের কারো মনে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। অথচ তরবারি ব্যতীত তাদের কাছে অন্য কোন অস্ত্র ছিল না। তিনি সাহাবায়ে-কিরামসহ যিলকদ মাসের শুরুতে সোমবার দিন রওয়ানা হন এবং যুলহুলায়ফায় পৌঁছে ইহ্রাম বাঁধেন।—(মাযহারী)

চতুর্থ অংশ মক্কাবাসীদের মুকাবিলার প্রস্তুতি ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) একটি বড় দল নিয়ে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেছেন--এই খবর যখন মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছল, তখন তারা পরামর্শ সভায় একত্রিত হল এবং বলল ঃ মুহাম্মদ (সা) সহচরগণসহ ওমরার জন্য আগমন করছেন। যদি আমরা তাকে নির্বিঘ্নে মক্কায় প্রবেশ করতে দিই, তবে সমগ্র আরবে এ কথা ছড়িয়ে পড়বে যে, সে আমাদেরকে পরাজিত করে মক্কায় পৌঁছে গেছে। অথচ আমাদের ও তার মধ্যে একাধিক যুদ্ধ হয়ে গেছে। অতঃপর তারা শপথ করে বলল ঃ আমরা কখনো এরূপ হতে দেব না। সেমতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বাধা দেওয়ার জন্য খালিদ ইবনে ওয়ালীদের নেতৃত্বে একটি দল মক্কার বাইরে 'কুরাউল-গামীম' নামক স্থানে প্রেরণ করা হল। তারা আশেপাশের গ্রামবাসীদেরকেও দলে ভিড়িয়ে নিল এবং তায়েফের বনী সকীফ গোত্রও তাদের সহযোগী হয়ে গেল। তারা বালদাহ্ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করল। অতঃপর তারা সবাই পরস্পরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মক্কা প্রবেশে বাধা দেওয়ার এবং তাঁর মুকাবিলায় যুদ্ধ করার শপথ করল।

সংবাদ পৌঁছানোর একটি অভাবনীয় সরল পদ্ধতি ঃ তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে যে, বালদাহ্ থেকে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পৌঁছার স্থান পর্যন্ত প্রত্যেকটি পাহাড়ের শৃঙ্গে কিছু লোক মোতায়েন করে দেয়—যাতে মুসলমানদের সম্পূর্ণ গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তাদের নিকটবর্তী পাহাড়ওয়ালা উচ্চস্বরে দ্বিতীয় পাহাড়ওয়ালা পর্যন্ত, সে তৃতীয় পর্যন্ত এবং সে চতুর্থ পর্যন্ত সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয়। এভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গতিবিধি সম্পর্কে বালদাহে অবস্থানকারীরা অবহিত হয়ে যেত।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সংবাদ প্রেরক ঃ মক্কাবাসীদের অবস্থা গোপনে পর্যবেক্ষণ করে সংবাদ প্রেরণের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা) বিশর ইবনে সুফিয়ানকে আগেই মক্কা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি মক্কা থেকে ফিরে এসে মক্কাবাসীদের উপরোক্ত সামরিক প্রস্তুতি ও পূর্ণ শক্তিতে বাধা দানের সংকল্পের কথা অবহিত করলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ কোরাইশদের জন্য আক্ষেপ, কয়েকটি যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও তাদের রণোন্মাদনা এতটুকু দমেনি।

আমাকে ও আরবের অন্যান্য গোত্রকে স্বাধীন ছেড়ে দিয়ে তারা নিজেরা সরে বসে থাকলেই পারত। যদি আরব গোত্রসমূহ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে যেত তবে তাদের মনোবাঞ্ছা ঘরে বসেই হাসিল হয়ে যেত। পক্ষান্তরে যদি আমি বিজয়ী হতাম, তবে হয় তারাও মুসলমান হয়ে যেত, না হয় যুদ্ধ করার ইচ্ছা থাকলেও তখন সবল ও সতেজ অবস্থায় আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারত। জানি না, কোরাইশরা কি মনে করছে। আল্লাহ্‌র কসম, তিনি আমাকে যে নির্দেশসহ প্রেরণ করেছেন, তার জন্য আমি একাকী হলেও চিরকাল ওদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকব।

পঞ্চম অংশ ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উষ্ট্রীর পথিমধ্যে বসে যাওয়া ঃ অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) সবাইকে একত্র করে ভাষণ দিলেন এবং পরামর্শ চাইলেন যে, এখন আমাদেরকে এখান থেকেই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করে দেওয়া উচিত, না আমরা বায়তুল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হব এবং কেউ বাধা দিলে তার সাথে যুদ্ধ করব? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও অন্যান্য সাহাবী বললেন ঃ আপনি বায়তুল্লাহ্‌র উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছেন, কারও সাথে যুদ্ধ করার জন্য বের হন নি। কাজেই আপনি উদ্দেশ্যে অটল থাকুন। হ্যাঁ, যদি কেউ আমাদেরকে মক্কা গমনে বাধা দেয়, তবে আমরা তার সাথে যুদ্ধ করব। এরপর হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ দাঁড়িয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা বনী ইসরাঈলের মত নই যে, আপনাকে বলে দেব ঃ اَذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا (আপনি ও আপনার পালনকর্তা যান এবং যুদ্ধ করুন। আমরা তো এখানেই বসলাম)। বরং আমরা সর্বাবস্থায় আপনার সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করব। রসূলুল্লাহ্ (সা) একথা শুনে বললেন ঃ ব্যস, এখন আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হও। যখন তিনি মক্কার নিকট পৌঁছলেন এবং খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে মক্কার দিকে অগ্রসর হতে দেখল, তখন তিনি সৈন্যদেরকে কিবলামুখী সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) ওব্বাদ ইবনে বিশরকে একদল সৈন্যের আমীর নিযুক্ত করে সম্মুখে প্রেরণ করলেন। তিনি খালিদ ইবনে ওয়ালীদের বাহিনীর বিপরীত দিকে সৈন্য সমাবেশ করলেন। এমতাবস্থায় যোহরের নামাযের সময় হয়ে গেল। হযরত বিলাল (রা) আযান দিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) সকলকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও তার সিপাহীরা এই দৃশ্য দেখতে লাগল। পরে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ বলল ঃ আমরা চমৎকার সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছি। তারা যখন নামাযরত ছিল, তখনই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত ছিল। যাক, অপেক্ষা কর তাদের আরও নামায আসবে। কিন্তু ইতিমধ্যে জিবরাঈল (আ) 'সালাতুল-খওফ' তথা আপদকালীন নামাযের বিধান নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শত্রুদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে জ্ঞাত করিয়ে নামাযের সময় সৈন্যদেরকে দুইভাগে ভাগ করার পদ্ধতি বলে দিলেন। ফলে তাঁরা শত্রুপক্ষের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয়ে যান।

ষষ্ঠ অংশ ঃ হুদায়বিয়ায় একটি মো'জেযা ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হুদায়বিয়ার নিকটবর্তী হন, তখন তাঁর উষ্ট্রীর সামনের পা পিছলে যায় এবং উষ্ট্রী বসে পড়ে। সাহাবায়ে কিরাম

চেষ্টা করেও উষ্ট্রীকে উঠাতে পারলেন না। তখন সবাই বলতে লাগলেন : কাসওয়া অবাধ্য হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : কাসওয়ার কোন কসুর নেই। তাঁর এরূপ অভ্যাস কখনও ছিল না। তাকে তো সেই আল্লাহ্ বাধা দিচ্ছেন, যিনি 'আসহাবে-ফীল' তথা হস্তী-বাহিনীকে বাধা দিয়েছিলেন। [রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্ভবত তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বপ্নে দেখা ঘটনা বাস্তবায়িত হওয়ার সময় এটা নয়]। তিনি বললেন : যার হাতে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রাণ, সেই সত্তার কসম, আজিকার দিনে আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনমূলক যে কোন কথা কোরাইশরা আমাকে বলবে, আমি অবশ্যই তা মেনে নেব। এরপর তিনি উষ্ট্রীকে একটি আওয়াজ দিতেই উষ্ট্রী উঠে দাঁড়াল। রসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইবনে ওয়ালীদের দিক থেকে সরে গিয়ে হুদায়বিয়ার অপর প্রান্তে অবস্থান গ্রহণ করলেন। সেখানে পানি খুবই কম ছিল। পানির জায়গা খালিদ ইবনে ওয়ালীদ করায়ত্ত করে নিয়েছিল। মুসল-মানদের অংশে একটি মাত্র কূপ ছিল, যাতে অল্প অল্প পানি চুয়ে চুয়ে কূপে পড়ত। সেমতে এই কূপের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি মো'জেযা প্রকাশ পেল, তিনি কূপের মধ্যে কুলি কর-লেন এবং একটি তীর কূপের ভিতরে গেড়ে দিতে বললেন। ফলে কূপের পানি ফুলে ফেঁপে কূপের প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে গেল। অতঃপর পানির কোন অভাব রইল না।

সপ্তম অংশ : প্রতিনিধিদলের মধ্যস্থতায় মক্কাবাসীদের সাথে আলাপ-আলোচনা : অতঃপর প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে মক্কাবাসীদের সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু হল। প্রথমে বুদায়েল ইবনে ওয়ারাক্কা সঙ্গীগণসহ আগমন করল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে বলল : কোরাইশরা পূর্ণ শক্তি সহকারে মুকাবিলা করার জন্য এসে গেছে এবং পানির জায়গা দখল করে নিয়েছে। তারা কিছুতেই আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। রসূলে করীম (সা) বললেন : আমরা কারও সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি। তবে কেউ যদি আমাদেরকে ওমরা পালন করতে বাধা দেয়, তবে আমরা যুদ্ধ করব। অতঃপর তিনি ইতিপূর্বে বিশরকে যা বলেছিলেন, তারই পুনরাবৃত্তি করে বললেন : কোরাইশদেরকে কয়েকটি যুদ্ধ দুর্বল করে দিয়েছে। তারা ইচ্ছা করলে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য আমাদের সাথে সন্ধি করে নিতে পারে, যাতে তারা নির্বিঘ্নে প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ পায়। এরপর আমাদেরকে অবশিষ্ট আরবদের মুকাবিলায় ছেড়ে দিতে পারে। যদি তারা বিজয়ী হয়, তবে কোরাইশ-দের মনোবাঞ্ছা ঘরে বসেই পূর্ণ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে তারা হয় মুসলমান হয়ে যাবে, না হয় আমাদের বিরুদ্ধে নব বলে যুদ্ধ করবে। কোরাইশরা যদি এতে সম্মত না হয়, তবে আল্লাহ্র কসম, আমি একাকী হলেও ইসলামের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাব। কোরাইশদেরকে এই পয়গাম পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে বুদায়েল ফিরে গেল। সেখানে পৌঁছার পর কিছু লোক তার কথা শুনতেই চাইল না। তারা যুদ্ধের নেশায় মত্ত হয়ে রইল। অতঃপর গোত্র-সরদার ওরওয়া ইবনে মসউদ বলল : বুদায়েল কি বলতে চায়, তা শুনা দরকার। কথাবার্তা শুনে ওরওয়া কোরাইশ সরদারদেরকে বলল : মুহাম্মদ যা প্রস্তাব দিয়েছে, তা সঠিক। এটা মেনে নাও এবং আমাকে তার সাথে কথা বলার অনুমতি দাও। সেমতে দ্বিতীয়বার ওরওয়া ইবনে মসউদ আলাপ-আলোচনার জন্য উপস্থিত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরয করল : আপনি যদি স্বগোত্র কোরাইশকে নিশ্চিহ্নই করে দেন, তবে এটা কি করে ভাল কথা হবে? দুনিয়াতে আপনি কি কখনো শুনেছেন যে, কোন

ব্যক্তি তার স্বজাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে? অতঃপর সাহাবায়ে কিরামের সাথে তার নরম গরম কথাবার্তা হতে থাকে। ইতিমধ্যেই সে সাহাবায়ে কিরামের এই আত্মোৎসর্গমূলক অবস্থা প্রত্যক্ষ করল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) থুথু ফেললে তারা তা হাতে নিয়ে নিজ নিজ মুখ-মণ্ডলে মালিশ করে। তিনি ওযূ করলে সাহাবায়ে কিরাম ওযূর পানির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মুখমণ্ডলে মালিশ করে। তিনি কথা বললে সবাই নিশ্চুপ হয়ে যায়। ওরওয়া ফিরে গিয়ে কোরাইশ সরদারদের কাছে বর্ণনা করল ঃ আমি কায়সার ও কিসরার ন্যায় বড় বড় রাজকীয় দরবারে গমন করেছি এবং নাজ্জাশীর কাছে গিয়েছি কিন্তু আল্লাহ্র কসম, আমি এমন কোন রাজা-বাদশাহ্ দেখিনি, যার জাতি তার প্রতি এতটুকু আত্মোৎসর্গকারী, যতটুকু মুহাম্মদের প্রতি তাঁর সহচরগণ আত্মোৎসর্গকারী। মুহাম্মদের কথা সঠিক। আমার অভিমত এই যে, তোমরা তার প্রস্তাব মেনে নাও। কিন্তু কোরাইশরা বলে দিল ঃ আমরা তার প্রস্তাব মেনে নিতে পারি না। তাকে এ বছর ফিরে যেতে হবে এবং পরবর্তী বছর এসে ওমরা পালন করতে পারবে। আমরা এছাড়া অন্য কিছু মানি না। যখন ওরওয়ার কথায় কর্ণপাত করা হল না, তখন সে তার দল নিয়ে চলে গেল। এরপর জনৈক গ্রাম্য সরদার জলীম ইবনে আলকামা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আগমন করল। সাহাবায়ে কিরামকে ইহ্রাম অবস্থায় কুরবানীর জন্তুসহ দেখে সে-ও ফিরে গিয়ে স্বজাতিকে বোঝাতে চাইল যে, তারা বায়তুল্লাহ্য় ওমরা পালন করতে এসেছে। তাদেরকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। যখন কেউ তার কথা শুনল না, তখন সে-ও তার দল নিয়ে চলে গেল। অতঃপর একজন চতুর্থ ব্যক্তি আলাপ-আলোচনার জন্য আগমন করল। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকেও সেই কথাই বললেন, যা ইতিপূর্বে বুদায়েল ও ওরওয়াকে বলেছিলেন। সে ফিরে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জওয়াব কোরাইশদেরকে শুনিয়ে দিল।

অষ্টম অংশ ঃ হযরত ওসমান (রা)-কে পয়গামসহ প্রেরণ করা ঃ ইমাম বায়হাকী হযরত ওরওয়া থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হুদায়বিয়ায় পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করলেন, তখন কোরাইশরা ঘাবড়ে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কাছে নিজের কোন লোক পাঠিয়ে এ কথা বলে দিতে চাইলেন যে, আমরা যুদ্ধ করতে নয়, ওমরাহ্ পালন করতে এসেছি। অতএব আমাদের বাধা দিও না। এ কাজের জন্য তিনি হযরত ওমর (রা)-কে ডাকলেন। তিনি বললেন ঃ কোরাইশরা আমার ঘোর শত্রু। কারণ, তারা আমার কঠোর-তার বিষয়ে অবগত আছে। এছাড়া আমার গোত্রের এমন কোন লোক মক্কায় নেই, যে আমাকে সাহায্য করতে পারে। তাই আমি আপনার কাছে এমন একজন লোকের নাম প্রস্তাব করছি, যিনি মক্কায় গোত্রগত কারণে বিশেষ শক্তি ও মর্যাদার অধিকারী। তিনি হলেন হযরত ওসমান ইবনে আফফান। রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ওসমান (রা)-কে এ কাজের আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে আরও বলে দিলেন যে, যেসব মুসলমান দুর্বল পুরুষ ও নারী মক্কা থেকে হিজরত করতে সক্ষম হয়নি এবং বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন আছে, তাদের কাছে যেয়ে সান্ত্বনা দেবে যে, তোমরা অস্থির হয়ো না। ইনশাআল্লাহ্ মক্কা বিজিত হয়ে তোমাদের বিপ-দাপদ দূর হওয়ার সময় নিকটবর্তী। হযরত ওসমান (রা) প্রথমে বালদাহে অবস্থানকারী কোরাইশ বাহিনীর কাছে পৌঁছলেন এবং তাদেরকে সেই পয়গাম শুনিয়ে দিলেন, যা ইতিপূর্বে বুদায়েল ও ওরওয়া ইবনে মসঊদকে শুনানো হয়েছিল। তারা বলল ঃ আমরা পয়গাম

শুনলাম। আপনি ফিরে গিয়ে বলে দিন যে, এটা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তাদের জওয়াব শুনে হযরত ওসমান (রা) যখন মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন, তখন পথিমধ্যে আবান ইবনে সাঈদের সাথে দেখা হল। আবান তাঁকে পেয়ে খুবই আনন্দিত হল এবং নিজ আশ্রয়ে নিয়ে বলল ঃ আপনি মক্কায় পয়গাম নিয়ে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনি মোটেও চিন্তা করবেন না। অতঃপর নিজের অশ্বে হযরত ওসমান (রা)-কে আরোহণ করিয়ে মক্কায় প্রবেশ করল। আবানের গোত্র বনূ সাঈদ মক্কায় অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল। হযরত ওসমান (রা) এক একজন সরদারের কাছে পৌঁছলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পয়গাম পৌঁছালেন। কিন্তু সবাই তা প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর হযরত ওসমান (রা) দুর্বল ও অক্ষম মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের কাছে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পয়গাম পৌঁছালেন। তারা খুবই আনন্দিত হল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাম বলল। পয়গাম পৌঁছানোর কাজ সমাপ্ত হলে মক্কাবাসীরা হযরত ওসমান (রা)-কে বলল ঃ আপনি ইচ্ছা করলে তওয়াফ করতে পারেন। হযরত ওসমান (রা) বললেন ঃ আমি তও-য়াফ করতে পারি না, যে পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (সা) তওয়াফ না করেন। হযরত ওসমান (রা) মক্কায় তিন দিন অবস্থান করেন এবং কোরাইশদের রাযী করাবার প্রচেষ্টা চালান।

নবম অংশ ঃ মক্কাবাসী ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং মক্কাবাসীদের সত্তর-জনের গ্রেফতারী ঃ ইতিমধ্যে কোরাইশরা তাদের পঞ্চাশজন লোককে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকটে পৌঁছে সুযোগ বুঝে তাঁকে হত্যা করার জন্য নিযুক্ত করল। তারা সুযোগের অপে-ক্ষায়ই ছিল, এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হিফাযত ও দেখাশুনায় নিযুক্ত হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে উপস্থিত করলেন। অপরদিকে হযরত ওসমান (রা) মক্কায় ছিলেন এবং তাঁর সাথে আরও প্রায় দশজন মুসলমান মক্কা পৌঁছেছিলেন। কোরাইশরা তাদের পঞ্চাশজনের গ্রেফতারীর সংবাদ শুনে হযরত ওসমানসহ সব মুসলমানকে আটক করল। এতদ্ব্যতীত কোরাইশদের একদল সৈন্য মুসল-মান সৈন্যবাহিনীর দিকে অগ্রসর হয়ে তাদের প্রতি তীর ও প্রস্তর নিক্ষেপ করল। এতে একজন সাহাবী ইবনে যনীম শহীদ হলেন। মুসলমানরা কোরাইশদের দশজন অশ্বারোহীকে গ্রেফতার করে নিল। অপরপক্ষে হযরত ওসমান (রা)-কে হত্যা করা হয়েছে বলেও গুজব ছড়িয়ে পড়ল।

দশম অংশ ঃ বায়'আতে-রিযওয়ানের ঘটনা ঃ হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে একটি বৃক্ষের নীচে একত্র করলেন, যাতে সবাই জিহাদের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাতে বায়'আত করেন। সকলেই তাঁর হাতে বায়'আত করলেন। এই সূরায় এই বায়'আতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ্ হাদীসসমূহে এই বায়'আতে অংশগ্রহণকারীদের অসাধারণ ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। হযরত ওসমান (রা) রসূ-লুল্লাহ্ (সা)-র নির্দেশে মক্কা গমন করেছিলেন। তাই তাঁর পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের এক হাতের উপর অপর হাত রেখে বললেন ঃ এটা ওসমানের বায়'আত। তিনি নিজের হাতকেই ওসমানের হাত গণ্য করে বায়'আত করলেন। এই বিশেষ ফযীলত হযরত ওসমানেরই বৈশিষ্ট্য।

একাদশ অংশ ঃ হুদায়বিয়ার ঘটনা ঃ অপরদিকে মক্কাবাসীদের মনে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের প্রতি ভয়ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা স্বয়ং সন্ধি স্থাপনে উদ্যোগী

হয়ে সোহায়েল ইবনে আমর, হোয়ায়তাব ইবনে আব্দুল ওযযা ও মুকরিম ইবনে হিফসকে ওযর পেশ করার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট প্রেরণ করল। তাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইজন পরে মুসলমান হয়েছিল। সোহায়েল ইবনে আমর এসে আরয করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হযরত ওসমান ও তাঁর সঙ্গীদের হত্যা সম্পর্কিত যে সংবাদ আপনার কাছে পৌঁছেছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আপনি আমাদের বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিন। আমরাও তাদের আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। রসূলুল্লাহ্ (সা) কাফির বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিলেন। মসনদে আহমদ ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই সূরার هُوَ الَّذِىْ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ আয়াতটি এই ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর সোহায়েল ও তার সঙ্গীরা ফিরে গিয়ে বায়'আতে রিযওয়ানে সাহাবায়ে কিরামের প্রাণচাঞ্চল্য ও আত্মনিবেদনের অভূতপূর্ব অবস্থা কোরাইশদের সামনে বর্ণনা করল। দূতদের মুখে এসব অবস্থা শুনে শীর্ষস্থানীয় কোরাইশ নেতৃবৃন্দ পরস্পরে বলল ঃ এখন মুহাম্মদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করে নেওয়াই আমাদের পক্ষে উত্তম যে, তিনি এ বছর ফিরে যাবেন, যাতে সমগ্র আরবে একথা খ্যাত না হয়ে পড়ে যে, আমাদের বাধাদান সত্ত্বেও তারা জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করেছে এবং পরবর্তী বছর ওমরা করার জন্য আগমন করবেন ও তিন দিন মক্কায় অবস্থান করবেন। সেমতে এই সোহায়েল ইবনে আমরই এই পয়গাম নিয়ে পুনরায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দরবারে উপস্থিত হল। তিনি সোহায়েলকে দেখা মাত্রই বললেন ঃ মনে হয় মক্কাবাসীরা সন্ধি স্থাপনে সম্মত হয়েছে। তাই সোহায়েলকে আবার প্রেরণ করেছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বসে গেলেন এবং ওব্বাদ ইবনে বিশর ও মাসলামা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে গেলেন। সোহায়েল উপস্থিত হয়ে সসম্ভ্রমে তাঁর সামনে বসে গেল এবং কোরাইশদের পয়গাম পৌঁছে দিল। সাহাবায়ে কিরাম তখন ওমরা না করে ইহ্রাম খুলে ফেলতে সম্মত ছিলেন না। তাঁরা সোহায়েলের সাথে কঠোর ভাষায় কথাবার্তা বললেন। সোহায়েলের স্বর কখনও উচ্চ এবং কখনও নম্র হল। ওব্বাদ সোহায়েলকে শাসিয়ে বললেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে উচ্চস্বরে কথা বলো না। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) কোরাইশদের শর্ত মেনে সন্ধি করতে সম্মত হলেন। সোহায়েল বলল ঃ আসুন, আমি নিজের ও আপনার মধ্যকার সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করি। রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে ডাকলেন এবং বললেন ঃ লিখ, বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম। সোহায়েল এখান থেকেই বিতর্ক শুরু করে বলল ঃ 'রাহমান' ও 'রাহীম' শব্দ আমাদের বাকপদ্ধতিতে নেই। আপনি এখানে সেই শব্দই লিখেন, যা পূর্বে লিখতেন ; অর্থাৎ 'বিইস্মিকা আল্লাহুমা'। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাও মেনে নিলেন এবং হযরত আলীকে তদ্রূপই লিখতে বললেন। এরপর তিনি হযরত আলী (রা)-কে বললেন ঃ লিখ এই অঙ্গীকারনামা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পাদন করছেন। সোহায়েল এতেও আপত্তি জানিয়ে বলল ঃ যদি আমরা আপনাকে আল্লাহ্র রসূল স্বীকারই করতাম, তবে কখনও বায়তুল্লাহ্ থেকে বাধা দান করতাম না। সন্ধিপত্রে কোন এক পক্ষের বিশ্বাসের বিপরীত কোন শব্দ থাকা উচিত নয়। আপনি শুধু মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করান। রসূলুল্লাহ্

(সা) তাও মেনে নিয়ে হযরত আলী (রা)-কে বললেন ঃ যা লিখেছ, তা কেটে ফেল এবং মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লিখ। হযরত আলী আনুগত্যের মূর্ত প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও আরয করলেন ঃ আমি আপনার নাম কেটে দিতে পারব না। উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে ওসায়দ ইবনে হুযায়র ও সাদ ইবনে ওবাদা দৌড়ে এসে হযরত আলী (রা)-র হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন ঃ কাটবেন না এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যতীত আর কিছুই লিখবেন না। যদি তারা না মানে, তবে আমাদের ও তাদের মধ্যে তরবারিই ফয়সালা করবে। চতুর্দিক থেকে আরও কিছু আওয়াজ উচ্চারিত হল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) সন্ধিপত্রটি নিজের হাতে নিয়ে নিলেন এবং নিরক্ষর হওয়া ও লেখার অভ্যাস না থাকা সত্ত্বেও স্বহস্তে এ কথাগুলো লিখে দিলেন ঃ

هذا ما قضى محمد بن عبد الله و سهيل بن عمرو اهلها على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيه الناس ويكف بعضهم عن بعض -

অর্থাৎ এই চুক্তি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ও সোহায়েল ইবনে আমর দশ বছর পর্যন্ত 'যুদ্ধ নয়' সম্পর্কে সম্পাদন করছেন। এই সময়ের মধ্যে সবাই নিরাপদ থাকবে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে।

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমাদের একটি শর্ত এই যে, আপাতত আমাদেরকে তওয়াফ করতে দিতে হবে। সোহায়েল বলল ঃ আল্লাহ্র কসম, এটা হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (সা) তাও মেনে নিলেন। এরপর সোহায়েল নিজের একটি শর্ত এই মর্মে লিপিবদ্ধ করল যে, মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে আপনার কাছে আগমন করবে, তাকে আপনি ফেরত দেবেন যদিও সে আপনার ধর্মাবলম্বী হয়। এতে সাধারণ মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের ধ্বনি উত্থিত হল। তারা বলল ঃ সোবহানাল্লাহ্! আমরা আমাদের মুসলমান ভাইকে মুশরিকদের হাতে ফিরিয়ে দেব—এটা কিরূপে সম্ভবপর? কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) এই শর্তও মেনে নিলেন এবং বললেন ঃ আমাদের কোন ব্যক্তি যদি তাদের কাছে যায়, তবে তাকে আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেন। তার জন্য আমরা চিন্তা করব কেন? তাদের কোন ব্যক্তি আমাদের কাছে আগমন করলে আমরা যদি তাকে ফিরিয়েও দেই, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সহজ পথ বের করে দেবেন। হযরত বারা (রা) এই সন্ধির সারমর্মে তিনটি শর্ত বর্ণনা করেছেন ঃ এক. তাদের কোন লোক আমাদের কাছে আসলে আমরা তাকে ফিরিয়ে দেব। দুই. আমাদের কোন লোক তাদের কাছে চলে গেলে তারা ফেরত দেবে না। এবং তিন. আমরা আগামী বছর ওমরার জন্য আগমন করব, তিনদিন মক্কায় অবস্থান করব এবং অধিক অস্ত্র নিয়ে আসব না। পরিশেষে লেখা হল এই অঙ্গীকারনামা মক্কাবাসী ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্র মধ্যে একটি সংরক্ষিত দলীল। কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করবে না। অবশিষ্ট আরববাসিগণ স্বাধীন। যার মনে চাইবে মুহাম্মদের অঙ্গীকারে দাখিল হবে এবং যার মনে চাইবে কোরাইশদের অঙ্গীকারে দাখিল হবে। একথা শুনে খোযায়া গোত্র

লাফিয়ে উঠল এবং বলল ঃ আমরা মুহাম্মদের অঙ্গীকারে দাখিল হচ্ছি, আর বনূ বকর সামনে অগ্রসর হয়ে বলল ঃ আমরা কোরাইশদের অঙ্গীকারে দাখিল হচ্ছি।

সন্ধির শর্তাবলীর কারণে সাহাবায়ে কিরামের অসন্তুষ্টি ও মর্মবেদনা ঃ যখন সন্ধির উপরোক্ত শর্তাবলী চূড়ান্ত হয়ে গেল, তখন হযরত ওমর (রা) স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আল্লাহ্র সত্য নবী নন? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই আমি সত্য নবী। হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারা কি মিথ্যায় পতিত নয়? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই। হযরত ওমর (রা) আরয করলেন ঃ আমাদের নিহত ব্যক্তিগণ জান্নাতে এবং তাদের নিহত ব্যক্তিগণ জাহান্নামে নয় কি? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই। এরপর হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ তবে আমরা কেন ওমরা না করে ফিরে যাবার অপমানকে কবূল করে নেব? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমি আল্লাহ্র বান্দা এবং রসূল হয়ে কখনও তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করব না। আল্লাহ্ আমাকে বিপথগামী করবেন না। তিনি আমার সাহায্যকারী। হযরত ওমর (রা) আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি একথা বলেন নি যে, আমরা বায়তুল্লাহ্র কাছে যাব এবং তওয়াফ করব? তিনি বললেন ঃ নিঃসন্দেহে একথা বলেছিলাম; কিন্তু আমি কি একথাও বলেছিলাম যে, এ কাজ এ বছরই হবে? হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ না, আপনি এরূপ বলেন নি। তিনি বললেন ঃ মনে রেখ, আমি যা বলেছি, তা অবশ্যই হবে। তুমি বায়তুল্লাহ্র কাছে যাবে এবং তওয়াফ করবে।

হযরত ওমর (রা) চুপ হয়ে গেলেন, কিন্তু মনের ক্ষোভ দমিত হচ্ছিল না। তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে গেলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি করলেন। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন ঃ আরে ভাই, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রসূল, তিনি আল্লাহ্র নির্দেশের বিরুদ্ধে কোন কাজ করবেন না। আল্লাহ্ তাঁর সাহায্যকারী। কাজেই তুমি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে আঁকড়ে থাক। আল্লাহর কসম, তিনি সত্যের উপর আছেন। মোটকথা, সন্ধির শর্তাবলীর কারণে হযরত ফারূকে-আযমের দুঃখ ও মর্মবেদনার অন্ত ছিল না। তিনি নিজে বলেন ঃ আল্লাহ্র কসম, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে এই একটি মাত্র ঘটনা ছাড়া আমার মনে কোন সময় সন্দেহ দেখা দেয়নি। (বুখারী) হযরত আবূ ওবায়দা (রা) তাকে বোঝালেন এবং বললেন ঃ শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। ফারূকে আযম (রা) বললেন ঃ আমি শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হযরত ওমর (রা) বলেন ঃ আমি যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলাম, তখন থেকে সর্বদা সদকা-খয়রাত করেছি, রোযা রেখেছি এবং ক্রীতদাস মুক্ত করেছি, যাতে আমার এই ত্রুটি মাফ হয়ে যায়।

আরও একটি দুর্ঘটনা ঃ চুক্তি পালনে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অপূর্ব কর্মতৎপরতা ঃ যে সময়ে সন্ধির শর্তাবলী চূড়ান্ত হয়েছিল এবং সাহাবায়ে কিরামের অসন্তুষ্টি প্রকাশ অব্যাহত ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে কোরাইশ পক্ষের স্বাক্ষরকারী সোহায়েল ইবনে আমরের পুত্র আবূ জন্দল হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হল। সে ইতিপূর্বে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল এবং পিতা সোহায়েল তাকে মক্কায় বন্দী করে রেখেছিল। শুধু তাই নয়, তার উপর অকথ্য নির্যাতনও চালানো হত।

সে কোনরূপে পলায়ন করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে পৌঁছে গেল এবং তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করল। কয়েকজন মুসলমান অগ্রসর হয়ে তাকে নিজেদের আশ্রয়ে নিয়ে নিল। কিন্তু সোহায়েল এই বলে চিৎকার করে উঠল যে, এটাই চুক্তির প্রথম বরখেলাফ কাজ হচ্ছে। আবূ জন্দলকে প্রত্যর্পণ করা না হলে আমি চুক্তির কোন শর্ত মেনে নিতে রাযী নই। রসূলুল্লাহ্ (সা) চুক্তিসূত্রে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই আবূ জন্দলকে ডেকে বললেন ঃ আবূ জন্দল, তুমি আরও কিছুদিন সবর কর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য এবং অন্যান্য অক্ষম মুসলমানের জন্য শীঘ্রই মুক্তি ও নিষ্কৃতির কোন ব্যবস্থা করে দেবেন। আবূ জন্দলের এই ঘটনা মুসলমানদের আহত অন্তরে আরও বেশি নিমক ছিটিয়ে দিল। তারা তো এই বিশ্বাস নিয়ে এসেছিল যে, মক্কা এই মুহূর্তেই বিজিত হয়ে যাবে। কিন্তু এখানকার অবস্থা দেখে তাদের দুঃখ ও মর্মবেদনার সীমা রইল না। তারা ধ্বংসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু সন্ধি-পত্র চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। সন্ধিপত্রে মুসলমানদের পক্ষ থেকে আবূ বকর, ওমর, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, আবদুল্লাহ্ ইবনে সোহায়েল ইবনে ওসর, সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা, আলী ইবনে আবী তালেব প্রমুখ স্বাক্ষর করলেন এবং কোরাইশদের পক্ষ থেকে সোহায়েল ও তার সঙ্গীরা স্বাক্ষর করল।

ইহ্‌রাম খোলা ও কুরবানী করা ঃ চুক্তি সম্পাদন সমাপ্ত হলে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সন্ধির শর্ত অনুযায়ী এখন আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। কাজেই সঙ্গে কুর-বানীর যেসব জন্তু আছে, সেগুলো কুরবানী করে ফেল এবং মাথা মুণ্ডিয়ে ইহ্‌রাম খুলে ফেল। উপর্যুপরি দুঃখ ও বেদনার কারণে সাহাবায়ে কিরাম যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই আদেশ সত্ত্বেও তারা স্ব-স্ব স্থান ত্যাগ করলেন না। ফলে রসূলুল্লাহ্ (সা) দুঃখিত হলেন এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমার কাছে পৌঁছে এই দুঃখ প্রকাশ করলেন। উম্মুল মু'মিনীন তাকে অত্যন্ত সময়োপযোগী পরামর্শ দিয়ে বললেন ঃ আপনি সহচরদেরকে কিছু বলবেন না। সন্ধির এক তরফা শর্তাবলী এবং ওমরা ব্যতীত ফিরে যাওয়ার কারণে এই মুহূর্তে তাঁরা ভীষণ মর্মবেদনা অনুভব করছে। আপনি সবার সামনে নাপিত ডেকে মাথা মুণ্ডান এবং নিজের জন্তু কুরবানী করুন। পরামর্শ অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা) তাই করলেন। এই দৃশ্য দেখে সাহাবায়ে কিরাম সবাই নিজ নিজ স্থান থেকে উঠলেন এবং একে অপরের মাথা মুণ্ডালেন ও কুরবানী করলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) সবার জন্য দোয়া করলেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) হুদায়বিয়ায় উনিশ দিন এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে কুড়ি দিন অবস্থান করেছিলেন। সাহাবায়ে কিরামের সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি প্রথমে মাররে যাহ্‌রান অতঃপর আসকানে পৌঁছেন। এখানে পৌঁছার পর সব মুসলমানের পাথেয় প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল। আহার্য বস্তু সামান্যই অবশিষ্ট ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) একটি দস্তরখান বিছালেন এবং সবাইকে আদেশ দিলেন--যার কাছে যা আছে এখানে রেখে দাও। ফলে অবশিষ্ট সমস্ত আহার্য বস্তু দস্তরখানে একত্র হয়ে গেল। চৌদ্দশ লোকের সমাবেশ ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) দোয়া করলেন এবং সবাইকে খাওয়া শুরু করার আদেশ দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম বর্ণনা করেন চৌদ্দশ লোক এই খাদ্য খুব পেট ভরে আহার করল এবং নিজ নিজ পাত্রে ভরে নিল। এরপরও পূর্বের ন্যায় আহার্য বস্তু অবশিষ্ট ছিল। এই সফরের এটা ছিল দ্বিতীয় মো'জেযা। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই দৃশ্য দেখে খুবই প্রীত হলেন।

সাহাবায়ে কিরামের ঈমান ও আনুগত্যের আরও একটি পরীক্ষা ঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সন্ধির শর্তাবলী ওমরা ব্যতিরেকে ও যুদ্ধে শৌর্যবীর্য প্রদর্শন ব্যতিরেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে দুঃসহ ছিল। অনন্য সাধারণ ঈমানের বলেই তাঁরা এসব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে রসূল (সা)-এর আনুগত্যে অটল ও অনড় থাকতে পেরেছিলেন। হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) 'ফুরা গামীম' নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন আলোচ্য 'সূরা ফাত্‌হ' অবতীর্ণ হয়। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে সূরাটি পাঠ করে শুনালেন। তাদের অন্তর পূর্বেই আহত ছিল। এমতাবস্থায় সূরায় একে প্রকাশ্য বিজয় আখ্যা দেওয়ায় হযরত ওমর (রা) আবার প্রশ্ন করে বসলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা কি বিজয়? তিনি বললেন ঃ যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, এটা প্রকাশ্য বিজয়। এই ভাষ্যের সামনেও সাহাবায়ে কিরাম মাথা নত করে নিলেন এবং গোটা পরিস্থিতিকে প্রকাশ্য বিজয় মেনে নিলেন।

হুদায়বিয়া সন্ধির ফলাফল ও কল্যাণের বিকাশ ঃ এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম প্রতিক্রিয়া এই প্রকাশ পায় যে, কোরাইশ ও তাদের অনেক অনুসারীর সামনে তাদের অন্যায় জেদ ও হঠকারিতা ফুটে ওঠে এবং তাদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়। বুদায়েল ইবনে ওয়ারাকা এবং ওরওয়া ইবনে মসউদ আপন আপন দল নিয়ে পৃথক হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত সাহাবায়ে কিরা-মের নজীরবিহীন আত্মনিবেদন ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি তাদের অনুপম অনুরাগ, সম্ভ্রম ও আনুগত্য দেখে কোরাইশরা ভীত হয়ে যায় এবং সন্ধি করতে সম্মত হয়। অথচ তাদের জন্য মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার এর চাইতে উত্তম সুযোগ আর ছিল না। কেননা, তারা নিজেদের বাড়ী ঘরে ছিল এবং মুসলমানগণ ছিলেন প্রবাসী। পানির জায়গাগুলো তাদের অধিকারে ছিল। মুসলমানগণ ছিলেন ঘাস পানিবিহীন প্রান্তরে। তাদের পূর্ণ রণশক্তি ছিল। মুসলমানদের কাছে তেমন অস্ত্রশস্ত্রও ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন। তাদের দলের অনেক লোক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে সাক্ষাৎ ও মেলা-মেশার সুযোগ পায়। ফলে অনেকের অন্তরে ইসলাম ও ঈমান আসন করে নেয় এবং পরে তারা মুসলমান হয়ে যায়। তৃতীয়ত সন্ধি ও শান্তি স্থাপনের কারণে পথঘাট নিরাপদ হয়ে যায় এবং ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সকল বাধা অপসারিত হয়। আরব গোত্রসমূহের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহা-বায়ে কিরাম আরবের কোণে কোণে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেন। বিভিন্ন রাজা বাদ-শাহ্‌র নামে ইসলামের দাওয়াতনামা প্রেরণ করা হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন বড় বড় বাদশাহ্ ইসলাম গ্রহণ করেন। এসব কার্যক্রমের ফল এই দাঁড়ায় যে, হুদায়বিয়ার ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ব্যাপক দাওয়াত ও ওমরার জন্য বের হওয়ার তাকীদ সত্ত্বেও যেখানে দেড় হাজারের বেশি মুসলমান সঙ্গে ছিল না, সেখানে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর দলে দলে লোক ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। এই সময়েই সপ্তম হিজরীতে খায়বর বিজিত হয়, যার ফলে বিপুল পরিমাণে সমরোপকরণ হস্তগত হয় এবং মুসলমানদের সমর শক্তি সুসংহত হয়। সন্ধির পর দুই বছর অতিক্রান্ত না হতেই মুসলমানদের সংখ্যা এত বেড়ে যায়, যা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। এরই ফলস্বরূপ কোরাইশদের পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের দরুন যখন

রসূলুল্লাহ্ (সা) গোপনে মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি শুরু করেন, তখন সন্ধির মাত্র বিশ-একুশ মাস পরে তাঁর সাথে মক্কা গমনকারী আত্মনিবেদিত মুসলমান সিপাহীদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। সংবাদ পেয়ে কোরাইশরা উদ্বিগ্ন হয়ে চুক্তি নবায়নের জন্য তড়িঘড়ি আবূ সুফিয়ানকে মদীনায় প্রেরণ করল। রসূলুল্লাহ্ (সা) চুক্তি নবায়ন করলেন না এবং অবশেষে আল্লাহ্র দশ হাজার লশকর সাথে নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন। কোরাইশরা এত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, মক্কায় তেমন কোন যুদ্ধের প্রয়োজনই হয়নি। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দূরদর্শী রাজনীতিও কিছুটা যুদ্ধ না হওয়ার পক্ষে সহায়তা করেছিল। তিনি মক্কায় ঘোষণা করে দেন যে, যে ব্যক্তি গৃহের দরজা বন্ধ করে রাখবে, সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ এবং যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। এভাবে সব মানুষ নিজ নিজ চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধের তেমন প্রয়োজন দেখা দেয়নি। এ কারণেই মক্কা সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, না যুদ্ধের মাধ্যমে---এ বিষয়ে ফিক্হশাস্ত্রবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মোট কথা, অতি সহজেই মক্কা বিজিত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বপ্ন বাস্তব ঘটনা হয়ে দেখা দেয়। সাহাবায়ে কিরাম নিশ্চিন্তে বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করেন, মাথা মুণ্ডান ও চুল কাটেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদেরকে নিয়ে বায়তুল্লায় প্রবেশ করেন। বায়তুল্লাহ্র চাবি তাঁর হস্তগত হয়। এ সময় তিনি বিশেষভাবে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবকে এবং সাধারণভাবে সকল সাহাবীকে সম্বোধন করে বলেন ঃ এই ঘটনাই আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম। এরপর বিদায় হজ্জের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ওমর (রা)-কে বলেন ঃ এই ঘটনাই আমি তোমাকে বলেছিলাম। হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ নিঃসন্দেহ কোন বিজয় হুদায়বিয়ার সন্ধির চাইতে উত্তম ও মহান নয়। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তো পূর্ব থেকেই একথা বলতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টি আল্লাহ্ ও রসূল (সা)-এর মধ্যকার এই মীমাংসিত সত্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তারা স্বপ্নের দ্রুত বাস্তবায়ন কামনা করত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের দ্রুততা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে দ্রুততা অবলম্বন করেন না, বরং তাঁর প্রত্যেক কাজ যথার্থ সময়েই সম্পন্ন হয়। তাই 'সূরা ফাত্হে' আল্লাহ্ তা'আলা হুদায়বিয়ার ঘটনাকে প্রকাশ্য বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির এসব গুরুত্বপূর্ণ অংশ জানার পর পরবর্তী আয়াতসমূহ বোঝা সহজ হবে। এখন আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন।

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ এখানে প্রথমোক্ত لام-কে কারণ বর্ণনার জন্য ধরা হলে এর সারমর্ম এই হবে যে, আয়াতে বর্ণিত তিনটি অবস্থা অর্জিত হওয়ার জন্য আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করা হয়েছে। তিনটি অবস্থা এই ঃ এক. আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ গোনাহ্ মাফ করা। সূরা মুহাম্মদে প্রথমে বর্ণিত হয়েছে যে, পয়গম্বরগণ গোনাহ্ থেকে পবিত্র। তাঁদের বেলায় কোরআনে যেখানে সেখানে ذنب অথবা عصيان (গোনাহ্) শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, তা তাঁদের উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তমের বিপরীত কাজ করার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। নবুয়তের উচ্চ মর্যাদার দিক দিয়ে অনুত্তম কাজ করাও একটি ত্রুটি যাকে কোরআনে শাসানোর ভঙ্গিতে ذنب তথা গোনাহ্ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত

করা হয়েছে। ما تقدم বলে নবুয়তের পূর্ববর্তী ত্রুটি এবং ما تاخر বলে নবুয়ত লাভের পরবর্তী ত্রুটি বোঝানো হয়েছে। —(মাযহারী) প্রকাশ্য বিজয় এই ক্ষমার কারণ এজন্য যে, এই প্রকাশ্য বিজয়ের ফলে দলে দলে লোক ইসলামে দাখিল হবে। ইসলামী দাওয়াতের ব্যাপক আকার লাভ করা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জীবনের মহান লক্ষ্যকে সমুন্নত করবে এবং তাঁর সওয়াব ও প্রতিদানকে বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, সওয়াব ও প্রতিদান বেড়ে যাওয়া ত্রুটি মার্জনার কারণ হয়ে থাকে। —(বয়ানুল- কোরআন)

وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا—এটা প্রকাশ্য বিজয়ের দ্বিতীয় কল্যাণ। এখানে প্রশ্ন হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তো পূর্ব থেকেই 'সিরাতে-মুস্তাকীম' তথা সরল পথে ছিলেন এবং শুধু তিনিই নন বরং বিশ্ববাসীকে এই সরল পথের দাওয়াত দেওয়াই ছিল তাঁর জীবনের মহান ব্রত। অতএব, হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে প্রকাশ্য বিজয়ের মাধ্যমে সরল পথ পরিচালনা করার মানে কি? এই প্রশ্নের জওয়াব সূরা ফাতিহার তফসীরে 'হিদায়ত' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ 'হিদায়ত' একটি ব্যাপক শব্দ। এর অসংখ্য স্তর আছে। কারণ, হিদায়তের অর্থ অভীষ্ট মনযিলের পথ দেখানো অথবা সেখানে পৌঁছানো। প্রত্যেক মানুষের আসল অভীষ্ট মনযিল হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। এই নৈকট্য ও সন্তুষ্টির অসংখ্য ও অগণিত স্তর আছে। এক স্তর অর্জিত হওয়ার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর অর্জনের আবশ্যকতা বাকী থাকে। কোন বৃহত্তম ওলী এমনকি নবী-রসূলও এই আবশ্যকতা থেকে মুক্ত হতে পারেন না। এ কারণেই নামাযের প্রত্যেক রাক'আতে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ বলে দোয়া করার শিক্ষা যেমন উম্মতকে দেওয়া হয়েছে, তেমনি স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কেও দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকীমের হিদায়ত তথা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টির স্তরসমূহে উন্নতি লাভ করা। এই প্রকাশ্য বিজয়ের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা এই নৈকট্য ও সন্তুষ্টিরই একটি অত্যুচ্চ স্তর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দান করেছেন, যাকে يَهْدِيَكَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا—এটা প্রকাশ্য বিজয়ের তৃতীয় নিয়ামত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার যে সাহায্য ও সমর্থন আপনি চিরকাল লাভ করে এসেছেন, এই প্রকাশ্য বিজয়ের ফলস্বরূপ তার একটি মহান স্তর আপনাকে দান করা হয়েছে।

هُوَ الَّذِيٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ؕ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا

حَكِيمًا ۝ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۝ وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِينَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّينَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۚ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ۝ وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

(৪) তিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৫) ঈমান এজন্য বেড়ে যায়, যাতে তিনি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে এবং যাতে তিনি তাদের পাপ মোচন করেন। এটাই আল্লাহ্‌র কাছে মহা-সাফল্য। (৬) এবং যাতে তিনি কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী নারী এবং অংশীবাদী পুরুষ ও অংশীবাদিনী নারীদেরকে শাস্তি দেন, যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে। তাদের জন্য মন্দ পরিণাম। আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন। এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন। তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল অত্যন্ত মন্দ। (৭) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিনি মুসলমানদের অন্তরে সহনশীলতা সৃষ্টি করেছেন, (যার প্রতিক্রিয়া দু'টি— এক. জিহাদের বায়'আতের সময় এগিয়ে যাওয়া, সংকল্প ও সাহসিকতা ; যেমন বায়'আতে রিযওয়ানের ঘটনায় পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং দুই. কাফিরদের অন্যায় হঠকারিতার সময় নিজেদের জোশ ও ক্রোধকে বশে রাখা। হুদায়বিয়ার ঘটনার দশম অংশে এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهٗ عَلٰى رَسُولِهٖ আয়াতেও বর্ণিত হবে)। যাতে তাদের আগেকার ঈমানের সাথে তাদের ঈমান আরও বেড়ে যায়। কেননা, আসলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আনুগত্য ঈমানের নূর বৃদ্ধি পাওয়ার একটি উপায়। এই ঘটনায়

প্রত্যেক দিক দিয়ে রসূল (সা)-এর পূর্ণ আনুগত্যের পরীক্ষা হয়েছে। রসূল (সা) যখন জিহা-দের ডাক দিলেন এবং বায়'আত নিলেন তখন সবাই হৃষ্টচিত্তে এগিয়ে এসে বায়'আত করল এবং জিহাদের জন্য তৈরী হল। এরপর যখন রহস্য ও উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে রসূল (সা) জিহাদ করতে নিষেধ করলেন, তখন সকল সাহাবী জিহাদের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত ও অস্থির হওয়া সত্ত্বেও রসূল (সা)-এর আনুগত্যে মাথানত করে দিলেন এবং জিহাদ থেকে বিরত থাকেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ (যেমন ফেরেশতা ও অন্যান্য সৃষ্টি জীব) আল্লাহ্রই। তাই কাফিরদেরকে পরাজিত করা ও ইসলামকে সমুন্নত করার জন্য তোমাদের জিহাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা মুখাপেক্ষী নন। তিনি ইচ্ছা করলে ফেরেশতাদের বাহিনী প্রেরণ করতে পারেন; যেমন বদর, আহযাব ও হুনায়নের যুদ্ধে তা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। এই বাহিনী প্রেরণ করাও মুসলমানদের সাহস বৃদ্ধি করার জন্য; নতুবা একজন ফেরেশতাই সবাইকে খতম করার জন্য যথেষ্ট। অতএব কাফিরদের সংখ্যাধিক্য দেখে জিহাদে যেতে তোমাদের ইতস্তত করা উচিত নয় এবং আল্লাহ্ ও রসূল (সা)-এর পক্ষ থেকে জিহাদ বর্জন করার আদেশ হলে তাতেও ইতস্তত করা সমীচীন নয়। জিহাদকরণ ও জিহাদ বর্জনের ফলাফল ও পরিণাম আল্লাহ্ তা'আলাই বেশী জানেন। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা (উপযো-গিতা সম্পর্কে) সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়, [জিহাদকরণ উপযোগী হলে তার নির্দেশ দেন। তাই উভয় অবস্থায় মুসলমানদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে রসূল (সা)-এর আদেশের অনুগত রাখা উচিত। এটা ঈমান বৃদ্ধির কারণ। অতঃপর ঈমান বৃদ্ধির ফলাফল বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ] এবং যাতে আল্লাহ্ (এই আনুগত্যের বদৌলতে) মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেথায় তারা চিরকাল থাকবে। এবং যাতে (এই আনুগত্যের বদৌলতে) তাদের পাপ মোচন করেন [কেননা পাপ কর্ম থেকে তওবা এবং সৎ কর্ম সম্পাদন সবই রসূল (সা)-এর আনুগত্যের মধ্যে দাখিল, যা সমস্ত পাপ মোচনকারী] এটা (অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হল) আল্লাহ্র কাছে মহা সাফল্য। (এই আয়াতে প্রথম মু'মিনদের অন্তরে শান্তি ও সহনশীলতা নাযিল করার নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এই নিয়ামত রসূল (সা)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়েছে এবং রসূল (সা)-এর আনুগত্য জান্নাতে প্রবেশ করার কারণ হয়েছে। সুতরাং এসব বিষয় মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করারই ফল। অতঃপর এই প্রশান্তির ফল হিসাবেই মুনাফিকদের এ থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং এই বঞ্চিত হওয়ার কারণে আযাবে পতিত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ এই প্রশান্তি মুসলমানদের অন্তরে নাযিল করেছেন এবং কাফিরদের অন্তরে নাযিল করেন নি] যাতে আল্লাহ্ তা'আলা কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী নারীদেরকে (তাদের কুফরের কারণে) শাস্তি দেন, যারা আল্লাহ্র প্রতি কুধারণা পোষণ করে। (এখানে পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টে তাদের কুধারণা বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে ওমরা করার জন্য মক্কার দিকে যাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর তারা অস্বীকার করে পরস্পরে একথা বলেছিল ঃ তারা আমাদেরকে মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধে জড়িত করতে চায়। তাদেরকে যেতে দাও। তারা জীবিত ফিরে আসতে পারবে না। এ ধরনের উক্তি মুনাফিকদেরই হতে পারে। ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে সমস্ত কুফরী ও শিরকী বিশ্বাস এই কুধারণার অন্তর্ভুক্ত। অতএব, সব কাফির ও মুশরিকের জন্য এই শাস্তির সংবাদ যে, দুনিয়াতে) তারা বিপর্যয়ে

পতিত হবে। (সেমতে কিছুদিন পরেই তারা নিহত ও বন্দী হয়েছে। মুনাফিকদের সারা জীবন আক্ষেপ ও পরিতাপের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে। কারণ, মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল এবং তাদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছিল)। এবং (পরকালে) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন, তাদেরকে রহমত থেকে দূরে রাখবেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন। এটা খুবই মন্দ ঠিকানা। (অতঃপর এই শাস্তির এ বলে আরো দৃঢ় করা হচ্ছে যে) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী (অর্থাৎ পূর্ণ শক্তিমান। ইচ্ছা করলে যে কোন একটি বাহিনী দ্বারা সকলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতেন। কারণ তারা এরই উপযুক্ত। কিন্তু যেহেতু তিনি) প্রজ্ঞাময় (তাই উপযোগিতার কারণে শাস্তিদানের ব্যাপারে অবকাশ দেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার প্রথম তিন আয়াতে এই প্রকাশ্য বিজয়ের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত বিশেষ নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছে। হুদায়বিয়ার সফর সঙ্গী কয়েকজন সাহাবী আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এসব নিয়ামত তো আপনার জন্য। এগুলো আপনার জন্য মোবারক হোক ; কিন্তু আমাদের জন্য কি? এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াতে সরাসরি হুদায়বিয়ায় উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এসব নিয়ামত যেহেতু ঈমান ও রসূল (সা)-এর আনুগত্যের কারণ হয়েছে, তাই এগুলো সব মু'মিনও শামিল। কারণ, যে কেউ ঈমান ও আনুগত্যের পূর্ণতা লাভ করবে, সেই এসব নিয়ামতের যোগ্য পাত্র হবে।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

(৮) আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি অবস্থা ব্যক্তকারী রূপে, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে, (৯) যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা কর। (১০) যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহ্‌র কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতএব যে শপথ ভঙ্গ করে, অতি অবশ্যই সে তা

নিজের ক্ষতির জন্যই করে এবং যে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, আল্লাহ্ সত্বরই তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মুহাম্মদ!) আমি আপনাকে (কিয়ামতের দিন উম্মতের ক্রিয়াকর্মের) সাক্ষ্য-দাতা রূপে (সাধারণত) এবং (দুনিয়াতে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে) সুসংবাদদাতা রূপে এবং (কাফিরদেরকে) ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি, (হে মুসলমানগণ! আমি তাঁকে এ কারণে রসূল করে প্রেরণ করেছি) যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে (ধর্মের কাজে) সাহায্য ও সম্মান কর (বিশ্বাসগতভাবেও অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে সর্বগুণে গুণান্বিত এবং সর্বপ্রকার দোষত্রুটি থেকে পবিত্র মনে করে এবং কার্য-গতভাবেও অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য করে)। এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা (ও মহিমা) ঘোষণা কর। (এই পবিত্রতা ঘোষণার তফসীর নামায হলে সকাল-সন্ধ্যার ফরয নামায বোঝানো হয়েছে। নতুবা সাধারণ যিকর যদিও তা মুস্তাহাব হয়—বোঝানো হয়েছে। অতঃপর কতিপয় বিশেষ হক সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে ঃ) যারা আপনার কাছে (হুদায়বিয়ার দিবসে এ বিষয়ে) শপথ করছে (অর্থাৎ অঙ্গীকার করেছে) যে, জিহাদ থেকে পলায়ন করবে না, তারা বাস্তবে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে শপথ করছে। (কেননা, উদ্দেশ্য আপনার কাছে এ বিষয়ে শপথ করা যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান তারা প্রতিপালন করবে। অতএব যেন) আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতঃপর (শপথ করার পর) যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে (অর্থাৎ আনুগত্যের পরিবর্তে বিরুদ্ধাচরণ করবে), তার অঙ্গীকার ভঙ্গের শাস্তি তার উপরই বর্তাবে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, সত্বরই আল্লাহ্ তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর উম্মতকে বিশেষ করে বায়'আতে রিয-ওয়ানে অংশগ্রহণকারীদেরকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এসব নিয়ামত দানকারী ছিলেন আল্লাহ্ এবং দানের মাধ্যম ছিলেন রসূলুল্লাহ্ (সা)। তাই এর সাথে মিল রেখে আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ ও রসূলের হক এবং তাঁদের প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শনের কথা বলা হচ্ছে। প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে তাঁর তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

شاهد, مبشر و نذير

شاهد শব্দের অর্থ সাক্ষী। এর উদ্দেশ্য তাই, যা সূরা নিসার فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا আয়াতের তফসীরে দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র পয়গাম তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এরপর কেউ আনুগত্য করেছে

এবং কেউ নাফরমানী করেছে। এমনিভাবে নবী করীম (সা)-ও তাঁর উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবেন। সূরা নিসার আয়াতের তফসীরে কুরতুবী লিখেন ঃ পয়গম্বরগণের এই সাক্ষ্য নিজ নিজ যমানার লোকদের সম্পর্কে হবে যে, তাঁদের দাওয়াত কে কবূল করেছে এবং কে বিরোধিতা করেছে। এমনিভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাক্ষ্য তাঁর আমলের লোক-দের সম্পর্কে হবে। কেউ কেউ বলেন, এই সাক্ষ্য সমস্ত উম্মতের পুণ্য ও পাপ কাজ সম্পর্কে হবে। কেননা, কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, উম্মতের ক্রিয়াকর্ম সকাল-সন্ধ্যায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে পেশ করা হয়। কাজেই তিনি সমস্ত উম্মতের ক্রিয়া-কর্ম সম্পর্কে অবহিত হবেন।—(কুরতুবী)

بشير শব্দের অর্থ সুসংবাদদাতা এবং نذير শব্দের অর্থ সতর্ককারী। উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মতের আনুগত্যশীল মু'মিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেবেন এবং কাফির পাপাচারীদেরকে আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করবেন। অতঃপর রসূল প্রেরণের লক্ষ্য এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তদীয় রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। ঈমানের সাথে আরও তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা ঈমানদারদের মধ্যে থাকা বিধেয়—

تُعَزِّرُوهُ—تُوَقِّرُوهُ এবং تُسَبِّحُوهُ

تعزروه—শব্দটি تعزير ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সাহায্য করা। দণ্ডকেও এ কারণে تعزير বলা হয় যে, অপরাধীকে দণ্ড দিলে প্রকৃতপক্ষে তাকে সাহায্য করা হয়। ---(মুফরাদাতুল-কোরআন)

توقروه—শব্দটি توقير ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সম্মান করা। تسبحوه শব্দটি تسبيح ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পবিত্রতা বর্ণনা করা। সর্বশেষ শব্দটি নিশ্চিত-রূপে আল্লাহ্‌র জন্যই হতে পারে। তাই এর সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে বোঝা-নোর সম্ভাবনা নেই। এ কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদ প্রথমোক্ত দুই বাক্যের সর্বনাম দ্বারাও আল্লাহ্‌কেই বুঝিয়েছেন। অর্থ এই যে, বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আল্লাহ্‌কে অর্থাৎ তাঁর দীনকে ও রসূলকে সাহায্য কর, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর ও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর। কেউ কেউ প্রথমোক্ত দুই বাক্যের সর্বনাম দ্বারা রসূলকে বুঝিয়ে এরূপ অর্থ করেন যে, রসূলকে সাহায্য কর, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা কর। কিন্তু কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে, এতে সর্বনামসমূহের বিভিন্নতা জরুরী হয়ে পড়ে, যা অলংকার-শাস্ত্রের নীতি বিরুদ্ধ। এরপর হুদায়বিয়ার ঘটনার দশম অংশে বর্ণিত বায়'আতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাতে বায়'আত করেছে, তারা যেন স্বয়ং আল্লাহ্‌র হাতে বায়'আত করেছে। কারণ, এই বায়'আতের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। কাজেই তারা যখন রসূলের হাতে হাত রেখে বায়-'আত করল, তখন যেন আল্লাহ্‌র হাতেই বায়'আত করল। আল্লাহ্‌র হাতের স্বরূপ কারও জানা নেই এবং জানার চেষ্টা করাও দুরস্ত নয়।

বায়'আতের আসল শর্ত কোন বিশেষ কাজের জন্য শপথ গ্রহণ করা। একজন অপর-জনের হাতের উপর হাত রেখে শপথবাণী উচ্চারণ করা বায়'আতের প্রাচীন ও মসনূন তরীকা। তবে হাতের উপর হাত রাখা শর্ত বা জরুরী নয়। যে কাজের অঙ্গীকার করা হয়, তা পূর্ণ করা আইনত ওয়াজিব এবং বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম। তাই বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি বায়'আতের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। এতে আল্লাহ্ ও রসূলের কোন ক্ষতি হয় না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, আল্লাহ্ তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন।

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ اَمْوَالُنَا وَ اَهْلُوْنَا
فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۚ قُلْ
فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ
بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١١﴾ بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ
لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰٓى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّ زُيِّنَ ذٰلِكَ
فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ وَكُنْتُمْ قَوْمًا ۢبُوْرًا ﴿١٢﴾
وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ﴿١٣﴾
وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۭ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٤﴾

(১১) মরুবাসীদের মধ্যে যারা গৃহে বসে রয়েছে, তারা আপনাকে বলবে ঃ আমরা আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। অতএব, আমাদের পাপ মার্জনা করান। তারা মুখে এমন কথা বলবে, যা তাদের অন্তরে নেই। বলুন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষতি অথবা উপকার সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাকে বিরত রাখতে পারে? বরং তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয় পরিপূর্ণ জ্ঞাত। (১২) বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রসূল ও মু'মিনগণ তাদের বাড়ী-ঘরে কিছুতেই ফিরে আসতে পারবে না এবং এই ধারণা তোমাদের জন্য খুবই সুখকর ছিল। তোমরা মন্দ ধারণার বশবর্তী হয়েছিলে। তোমরা ছিলে ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়। (১৩) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করে না, আমি সেসব

কাফিরের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি। (১৪) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যেসব মরুবাসী (হুদায়বিয়া সফর থেকে) পশ্চাতে রয়ে গেছে, (সফরে শরীক হয়নি) তারা সত্বরই (যখন আপনি মদীনায় পৌঁছবেন) আপনাকে (মিছামিছি) বলবে (আমরা আপনার সাথে যাইনি কারণ) আমরা আমাদের ধনসম্পদ ও পরিবার-পরিজনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। অতএব আমাদের জন্য (এই ত্রুটি) মার্জনার দোয়া করুন। (এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মিথ্যাচার প্রকাশ করে বলেন ঃ) তারা মুখে এমন কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। [অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, তারা যখন আপনার কাছে এই ওযর পেশ করে, তখন] আপনি বলে দিন (প্রথমত এই ওযর সত্য হলেও আল্লাহ্ ও রসূলের অকাট্য নির্দেশের মুকাবিলায় তুচ্ছ ও বাতিল গণ্য হত। কেননা, আমি জিজ্ঞাসা করি,) আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষতি অথবা উপকার করার ইচ্ছা করলে কে তাঁর সামনে তোমাদের জন্য (উপকার ক্ষতি ইত্যাদি) কোন কিছুর ক্ষমতা রাখে? (অর্থাৎ তোমাদের সত্তা অথবা তোমাদের ধন-দৌলত ও পরিবার-পরিজনের মধ্যে যে উপকার অথবা ক্ষতি তকদীরে অবধারিত হয়ে গেছে, তার খেলাফ করার ক্ষমতা কারও নেই। তবে শরীয়ত অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের আশংকার ওযর কবূল করে অনুমতি দিয়েছে, যদি সেই ওযর বাস্তবে সত্য হয়। আলোচ্য প্রশ্নে শরীয়ত বাড়ী-ঘরের ব্যস্ততাকে গ্রহণযোগ্য ওযর সাব্যস্ত করেনি যদিও তা বাস্তবসম্মত হয়। দ্বিতীয়ত, তোমাদের পেশকৃত এই ওযর সত্যও নয়। তোমরা মনে কর যে, আমি এই মিথ্যা সম্পর্কে অবগত নই, কিন্তু সত্য এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা (যিনি) তোমাদের সব কাজকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত (তিনি আমাকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করেছেন যে, তোমাদের অনুপস্থিতির কারণ তা নয়, যা তোমরা বর্ণনা করছ) বরং (আসল কারণ এই যে,) তোমরা মনে করেছ যে, রসূল ও মু'মিনগণ কখনও তাঁদের বাড়ী-ঘরে ফিরে আসতে পারবেন না (মুশরিকদের হাতে সবাই প্রাণ হারাবে) এবং এই ধারণা তোমাদের মনেও খুব সুখকর ছিল (আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি শত্রুতার কারণে এটা তোমাদের আন্তরিক কামনাও ছিল)। তোমরা মন্দ ধারণার বশবর্তী হয়েছিলে। তোমরা (এসব কুফরী ধারণার কারণে) এক ধ্বংসমুখী সম্প্রদায় ছিলে। (এসব শাস্তির খবর শুনে তোমরা এখনও ঈমানদার হয়ে গেলে ভাল, নতুবা) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করে না, আমি সেসব কাফিরের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি। (মু'মিন ও অবিশ্বাসীদের জন্য এই আইন রচনার কারণে আশ্চর্যান্বিত হওয়া উচিত নয়, কেননা) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। (কাফির যদিও শাস্তির যোগ্য হয়, কিন্তু) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (কাজেই সেও খাঁটি মনে বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকেও ক্ষমা করে দেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত বিষয়বস্তু সেসব মরুবাসীর সাথে সম্পৃক্ত, যাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সা)

হুদায়বিয়ার সফরে সঙ্গে চলার আদেশ দিয়েছিলেন ; কিন্তু তারা নানা তালবাহানার আশ্রয় নেয়। হুদায়বিয়ার ঘটনার প্রথম অংশে একথা বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তাদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে তওবা করে এবং খাঁটি ঈমানদার হয়ে যায়।

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾ قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾ لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾

(১৫) তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবে ঃ আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। তারা আল্লাহ্‌র কালাম পরিবর্তন করতে চায়। বলুন ঃ তোমরা কখনও আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। আল্লাহ্ পূর্ব থেকেই এরূপ বলে দিয়েছেন। তারা বলবে ঃ বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ। পরন্তু তারা সামান্যই বুঝে। (১৬) গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিন ঃ আগামীতে তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহূত হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়। তখন যদি তোমরা নির্দেশ পালন কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেবেন। আর যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর যেমন ইতিপূর্বে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছ, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন। (১৭) অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য ও রুগ্নের জন্য কোন অপরাধ নেই এবং যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, তাকে তিনি জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা সত্বরই যখন (খায়বরের) যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা (হুদায়বিয়ার সফর থেকে) পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবেঃ আমাদেরকেও তোমাদের সাথে যাবার অনুমতি দাও। (এই আবেদনের কারণ ছিল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ করা। লক্ষণাদি দৃষ্টে এই সম্পদ লাভের বিষয় তাদের জানা ছিল এবং তারা তা প্রত্যাশাও করত। কিন্তু হুদায়বিয়ার সফরে কষ্ট ও ধ্বংসই অধিক প্রত্যাশিত ছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেনঃ) তারা আল্লাহ্র আদেশ পরিবর্তন করতে চায়। (অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশ ছিল এই যে, এই যুদ্ধে তারাই যাবে, যারা হুদায়বিয়া ও বায়'আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের ব্যতীত অন্য কেউ যাবে না; বিশেষত তারা যাবে না, যারা হুদায়বিয়ার সফরে অংশ-গ্রহণ করেনি এবং নানা তালবাহানার আশ্রয় নিয়েছে)। অতএব, আপনি বলে দিন, তোমরা কিছুতেই আমাদের সাথে যেতে পারবে না। (অর্থাৎ তোমাদের আবেদন আমরা মঞ্জুর করতে পারি না। কারণ, এতে আল্লাহ্র আদেশ পরিবর্তন করার গোনাহ্ আছে। কেননা,) আল্লাহ্ প্রথম থেকেই এই কথা বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ [হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার পথেই আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন যে, খায়বর যুদ্ধে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের ব্যতীত কেউ যাবে না। বাহ্যত এই আদেশ কোরআনে উল্লিখিত নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে, এই আদেশ অপঠিত ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা) লাভ করেছিলেন। এরূপ অপঠিত ওহী হাদীসের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়। একথাও সম্ভবপর যে, হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে অবতীর্ণ সূরা ফাত্হের اَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا আয়াতে খায়বরের বিজয় বোঝানো হয়েছে। সেমতে এই আয়াত ইঙ্গিত করেছে যে, খায়বরের বিজয় হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ-কারিগণই লাভ করবে। আপনার এই কথা শুনে উত্তরে] তখন তারা বলবেঃ [বাহ্যত এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুখের উপর বলা উদ্দেশ্য নয়; বরং তারা অন্যদেরকে বলবে যে, আমাদেরকে সাথে না নেওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ্র আদেশ নয়] বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ। (তাই আমাদের অংশগ্রহণ তোমাদের মনঃপূত নয়। অথচ মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষের কোন নামগন্ধও নেই।) বরং তারা অল্পই বুঝে। (পুরাপুরি বুঝলে আল্লাহ্র এই আদেশের রহস্য অনায়াসেই বুঝতে পারত যে, হুদায়বিয়ায় মুসলমানরা একটি বৃহত্তর আশংকার সম্মুখীন হয়েছে এবং অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। আর মুনা-ফিকরা তাদের পার্থিব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এটাই বিশেষভাবে মুসলমানদের খায়বর যুদ্ধে যাওয়ার এবং মুনাফিকদের বঞ্চিত হওয়ার কারণ। এ পর্যন্ত খায়বর সম্পর্কিত বিষয়বস্তু বর্ণিত হল। অতঃপর অপর একটি ঘটনা ইরশাদ হচ্ছেঃ) আপনি পশ্চাতে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে (আরও) বলে দিন, (এক খায়বর যুদ্ধে না গেলে তাতে কি হল, সওয়াব হাসিল করার আরও অনেক সুযোগ ভবিষ্যতে আসবে। সেমতে) সত্বরই তোমরা এমন লোকদের প্রতি (যুদ্ধ করার জন্য) আহূত হবে, যারা কঠোর যোদ্ধা (এখানে পারস্য ও রোমের সাথে যুদ্ধ বোঝানো হয়েছে)। [দুররে মনসূর] কেননা, তাদের সেনাবাহিনী ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, (ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য ও জিযিয়া দানে স্বীকৃত

হয়। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা এ কাজের জন্য আহূত হবে) অতএব (তখন) যদি তোমরা আনুগত্য কর (এবং তাদের সাথে জিহাদ কর) তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন। আর যদি তোমরা তখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, যেমন ইতিপূর্বে (হুদায়বিয়া) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছে, তবে তিনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন। (তবে জিহাদে অক্ষম ব্যক্তিগণ এর আওতা বহির্ভূত। সেমতে) অন্ধের জন্য কোন গোনাহ্ নেই, খঞ্জের জন্য কোন গোনাহ্ নেই এবং রুগ্নের জন্য কোন গোনাহ্ নেই। (উপরে জিহাদকারীদের জন্য জান্নাত ও নিয়ামতের যে ওয়াদা এবং জিহাদের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীদের জন্য যে শাস্তির খবর উচ্চারিত হয়েছে, তা বিশেষভাবে তাদের জন্যই নয় বরং) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূল (সা)-এর আনুগত্য করবে, তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত এবং যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সপ্তম হিজরীতে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বর যুদ্ধে গমন করার ইচ্ছা করলেন, তখন শুধু তাঁদেরকে সঙ্গে নিলেন, যাঁরা হুদায়বিয়ার সফর ও বায়'আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল (সা)-কে খায়বর বিজয় ও সেখানে প্রভূত গনীমতের মাল লাভের ওয়াদা দিয়েছিলেন। তখন যেসব মরুবাসী ইতিপূর্বে হুদায়বিয়ার সফরে আহূত হওয়া সত্ত্বেও ওযর পেশ করে অংশগ্রহণে বিরত ছিল, তারাও খায়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করল ; হয় এ কারণে যে, তারা লক্ষণাদি দৃষ্টে জানতে পেরেছিল যে, খায়বর বিজিত হবে এবং অনেক যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জিত হবে। না হয় এ কারণে যে, মুসলমানদের সাথে আল্লাহ্র ব্যবহার ও হুদায়বিয়ার সন্ধির বিভিন্ন কল্যাণ দেখে জিহাদে অংশগ্রহণ না করার কারণে তারা অনুতপ্ত হয়েছিল এবং এখন জিহাদে শরীক হওয়ার ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল। মোটকথা, তাদের জওয়াবে কোরআন বলেছে : يُرِيدُونَ أَنْ

يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ তারা আল্লাহ্র কালাম অর্থাৎ তাঁর আদেশ পরিবর্তন করতে চায়।

এই আদেশের অর্থ খায়বর যুদ্ধ ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিশেষ করে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী-দের প্রাপ্য। এরপর كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ বাক্যেও হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ-কারীদের এই বিশেষত্বের উল্লেখ আছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হয় যে, কোরআন পাকের কোথাও এই বিশেষত্বের উল্লেখ নেই। এমতাবস্থায় এই বিশেষত্বের ওয়াদাকে 'আল্লাহ্র কালাম' ও 'আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন' বলা কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে?

ওহী শুধু কোরআনে সীমাবদ্ধ নয়, কোরআন ছাড়াও ওহীর মাধ্যমে আদেশ এসেছে এবং রসূলের হাদীসও আল্লাহ্র কালামের হুকুম রাখে : আলিমগণ বলেন : হুদায়বিয়ায়

অংশগ্রহণকারীদের বিশেষত্ব সম্পর্কিত উল্লিখিত ওয়াদা কোরআন পাকের কোথাও স্পষ্ট-ভাবে উল্লেখ করা হয়নি ; বরং এই বিশেষত্বের ওয়াদা আল্লাহ্ তা'আলা 'ওহী গায়র-মতলু' অর্থাৎ অপঠিত ওহীর মাধ্যমে হুদায়বিয়ার সফরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দিয়েছিলেন। এ স্থলে একেই 'আল্লাহ্র কালাম' ও 'আল্লাহ্ ইতিপূর্বে বলে দিয়েছেন' বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, কোরআনের বিধানাবলী ছাড়া যেসব বিধান সহীহ্ হাদীস-সমূহে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোও এই আয়াত অনুযায়ী 'আল্লাহ্র কালাম'-ও আল্লাহ্র উক্তির মধ্যে দাখিল। যেসব ধর্মভ্রষ্ট লোক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাদীসকে ধর্মীয় প্রমাণ বলেই স্বীকার করে না, এসব আয়াত তাদের ধর্মভ্রষ্টতা ফাঁস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এখানে আরও একটি আলোচনাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, হুদায়বিয়া সফরের শুরুতে অবতীর্ণ এই সূরার অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে যে وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا—তফসীরবিদগণের ঐক্যমত্যে এখানে 'নিকটবর্তী বিজয়' বলে খায়বর বিজয় বোঝানো হয়েছে। এভাবে কোরআন খায়বর বিজয় ও তার যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের পাওয়ার কথা এসে গেছে। এটাই 'আল্লাহ্র কালাম' ও 'আল্লাহ্র উক্তির' অর্থ হতে পারে। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, এই আয়াতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা তো আছে ; কিন্তু একথা কোথাও বলা হয়নি যে, এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীরাই বিশেষভাবে পাবে, অন্যেরা পাবে না। এই বৈশিষ্ট্যের কথা নিঃসন্দেহে হাদীস দ্বারাই জানা গেছে। অতএব, 'আল্লাহ্র কালাম' ও আল্লাহ্র উক্তি বলে এখানে হাদীসই বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, 'আল্লাহ্র কালাম' বলে সূরা তওবার এই আয়াতকে বোঝানো হয়েছে ঃ

فَاسْتَأْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ ـ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِىَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِىَ عَدُوًّا ـ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ ـ

তাদের এই উক্তি শুদ্ধ নয়। কারণ, এই আয়াতগুলো তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যার সমকাল খায়বর যুদ্ধের পর নবম হিজরী।---(কুরতুবী)

قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا—এতে হুদায়বিয়া থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদেরকে তাকীদ সহকারে বলা হয়েছে ঃ তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। এই উক্তি বিশেষভাবে খায়বর যুদ্ধের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। ভবিষ্যতে অন্য কোন জিহাদেও শরীক হতে পারবে না---আয়াত থেকে এটা জরুরী নয়। এ কারণেই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মধ্য থেকে মুযায়না ও জোহায়না গোত্রদ্বয় পরবর্তীকালে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সঙ্গী হয়ে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।---(রূহুল মা'আনী)

হুদায়বিয়ার সফর থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের কেউ কেউ পরে তওবা করে খাঁটি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল ঃ হুদায়বিয়ার সফর থেকে যারা পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল,

তাদের সবাইকে খায়বরের জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল অথচ তাদের মধ্যে সবাই মুনাফিক ছিল না। কেউ কেউ মুসলমানও ছিল। কেউ কেউ যদিও তখন মুনাফিক ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা সাচ্চা ঈমানদার হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। তাই এ ধরনের লোকদের সন্তুষ্টির জন্য পরবর্তী আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনুযায়ী খায়বর যুদ্ধ হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা খাঁটি মুসলমান এবং মনেপ্রাণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্যও ভবিষ্যতে আরও সুযোগ-সুবিধা আসবে। এসব সুযোগের কথা কোরআন পাক একটি বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে বর্ণনা করেছে, যা রসূল করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর প্রকাশ পাবে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ অর্থাৎ এক সময় আসবে, যখন তোমাদেরকে জিহাদের দাওয়াত দেওয়া হবে। এই জিহাদ একটি শক্তিশালী যোদ্ধা জাতির সাথে হবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই জিহাদ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়নি। কেননা, প্রথমত, এরপর তিনি কোন যুদ্ধে মরুবাসীদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন বলে প্রমাণে নেই; দ্বিতীয়ত, এরপর এমন কোন বীরযোদ্ধা জাতির সাথে মুকাবিলাও হয়নি, যাদের বীরত্বের উল্লেখ কোরআন পাক করছে। তাবুক যুদ্ধে যদিও যোদ্ধা জাতির সাথে মুকাবিলা ছিল ; কিন্তু এই যুদ্ধে মরুবাসীদেরকে দাওয়াত দেওয়ার প্রমাণ নেই এবং এতে কোন যুদ্ধও সংঘটিত হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিপক্ষের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন। ফলে তারা সম্মুখ সমরে অবতীর্ণই হয়নি। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম বিনাযুদ্ধে তাবুক থেকে ফিরে আসেন। হুনায়ন যুদ্ধেও মরুবাসীদেরকে দাওয়াত দেওয়ার প্রমাণ নেই এবং তখন কোন সশস্ত্র ও বীরযোদ্ধা জাতির বিরুদ্ধে মুকাবিলাও ছিল না। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, আয়াতে পারস্য ও রোম অর্থাৎ কিসরা ও কায়সারের জাতিসমূহ বোঝানো হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর আমলে জিহাদ হয়েছে।---(কুরতুবী)

হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন ঃ আমরা কোরআনের এই আয়াত পাঠ করতাম ; কিন্তু আমাদের জানা ছিল না যে, এখানে কোন্ জাতিকে বোঝানো হয়েছে। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত কালে তিনি আমাদেরকে বনী হুনায়ফা ও মোসায়লামা কাযযাবের জাতির বিরুদ্ধে জিহাদ করার দাওয়াত দেন। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, এই আয়াতে এই জাতিকেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এই দু'টি উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ ও বৈপরীত্য নেই। পরবর্তীকালের শক্তিশালী সকল প্রতিপক্ষই এর মধ্যে দাখিল থাকতে পারে।

ইমাম কুরতুবী এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন ঃ হযরত সিদ্দীকে আকবর ও ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফত যে সত্যের অনুকূলে ছিল, এ আয়াত তার প্রমাণ। আলোচ্য আয়াতে স্বয়ং কোরআন তাঁদের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করেছে।

حَتّٰى يُسْلِمُوْا —হযরত উবাই এর কিরাআতে تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ

বলা হয়েছে। তদনুযায়ী কুরতুবী اَوْ অব্যয়কে حَتّٰى এর অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ সেই জাতির সাথে যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা আনুগত্যশীল হয়ে যায়, ইসলাম গ্রহণ করে অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে।

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ —হযরত ইবনে-আব্বাস (রা) বলেন, উপরের আয়াতে যখন জিহাদে অংশগ্রহণে পশ্চাতপদদের জন্য শাস্তির কথা উচ্চারিত হয়েছে, তখন সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কতক বিকলাঙ্গ লোক চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে, তাঁরা জিহাদে অংশ-গ্রহণ করার যোগ্য নয়। ফলে তারাও নাকি এই শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্নকে জিহাদের আদেশের আওতা-বহির্ভূত করে দেওয়া হয়েছে।---(কুরতুবী)

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿١٨﴾ وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٩﴾ وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢٠﴾ وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢١﴾

(১৮) আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ্ অবগত ছিলেন, যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। (১৯) এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ; প্রজ্ঞাময়। (২০) আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদের স্তব্ধ

করে দিয়েছেন---যাতে এটা মু'মিনদের জন্য এক নিদর্শন হয় এবং তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (২১) আরও একটি বিজয় রয়েছে যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসেনি, আল্লাহ্ তা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চিতই আল্লাহ্ (আপনার সফরসঙ্গী) মুসলমানদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তাঁরা আপনার কাছে বৃক্ষের নীচে (জিহাদে দৃঢ়পদ থাকার) শপথ করছিল। তাদের অন্তরে যা কিছু (আন্তরিকতা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করার সংকল্প) ছিল, আল্লাহ্ তাও অবগত ছিলেন। (তখন) আল্লাহ্ তাদের অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করে দেন। (ফলে আল্লাহ্র আদেশ পালনে তারা মোটেই ইতস্তত করেনি। এগুলো ছিল ইন্দ্রিয় বহির্ভূত নিয়ামত। এর সাথে কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিয়ামতও তাদেরকে দেওয়া হয়। সেমতে) তাদেরকে বিজয় দান করেন (অর্থাৎ খায়বর বিজয়) এবং (এই বিজয়ে) বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদও (দিলেন) যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (স্বীয় কুদরত ও রহস্য বলে যখন যাকে ইচ্ছা বিজয় দান করেন। এই খায়বর বিজয়ই শেষ নয়; বরং) আল্লাহ্ তোমাদেরকে (আরও) বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়ে রেখেছেন, যা তোমরা লাভ করবে। অতএব (সেসব সম্পদের মধ্য থেকে) এটা তোমাদেরকে তাৎক্ষণিক দান করেছেন এবং (এই দানের জন্য খায়বরবাসী ও তাদের মিত্র) লোকদের হাত তোমাদের থেকে স্তব্ধ করে দিয়েছেন, (অর্থাৎ সবার অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিয়েছেন। ফলে তারা আর বেশী হাত বাড়ানোর সাহস পায়নি। এতে করে তোমাদের পার্থিব উপকারও উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তোমরা আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ কর) এবং (ধর্মীয় উপকারও ছিল) যাতে এটা (অর্থাৎ এই ঘটনা) মু'মিনদের জন্য (অন্যান্য ওয়াদা সত্য হওয়ার) এক নিদর্শন হয় (অর্থাৎ আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য হওয়ার ব্যাপারে ঈমান আরও মজবুত হয়) এবং যাতে (এই নিদর্শনের মাধ্যমে) তোমাদেরকে (ভবিষ্যতের জন্য প্রত্যেক কাজে) সরল পথে পরিচালিত করেন (মানে তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ্র উপর ভরসার পথে। উদ্দেশ্য এই যে, চিরদিনের জন্য এই ঘটনা চিন্তা করে যাতে আল্লাহ্র প্রতি আস্থা রাখ। এভাবে ধর্মীয় উপকার দু'টি হয়ে যায়। এক জ্ঞানগত ও বিশ্বাসগত উপকার, যা وَلِتَكُونَ বলে বর্ণিত হয়েছে এবং দুই. কর্মগত ও চরিত্রগত উপকার, যা يَهْدِيَكُمْ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে)। এবং আরও একটি বিজয় (প্রতিশ্রুত) রয়েছে, যা (এ পর্যন্ত) তোমাদের অধিকারে আসেনি (অর্থাৎ মক্কা বিজয়। যা তখন পর্যন্ত বাস্তব রূপ লাভ করেনি) কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তা বেষ্টন করে আছেন (যখন ইচ্ছা করবেন, তোমাদেরকে দান করবেন) এবং (এরই কি বিশেষত্ব) আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَقَدْ رَضِىَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ — এখানে হুদায়বিয়ার শপথ বোঝানো হয়েছে। ইতিপূর্বেও اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ আয়াতে এর উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতও তারই তাকীদ। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই শপথে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি স্বীয় সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই একে 'বায় আতে রিযওয়ান' তথা সন্তুষ্টির শপথও বলা হয়। এর উদ্দেশ্য শপথে অংশগ্রহণকারীদের প্রশংসা করা এবং তাদেরকে অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি জোর তাকীদ করা। বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, হুদায়বিয়ার দিনে আমাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশ। রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন : انتم خير اهل الارض — অর্থাৎ তোমরা ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সহীহ্ মুসলিমে উম্মে বাশার থেকে বর্ণিত আছে : لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة — অর্থাৎ যারা এই বৃক্ষের নীচে শপথ করেছে, তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।—(মাযহারী) তাই এই শপথে অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অনুরূপ হয়ে গেছে। তাঁদের সম্পর্কে যেমন কোরআন ও হাদীসে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ বর্ণিত রয়েছে, তেমনি হুদায়বিয়ার শপথে অংশগ্রহণকারীদের জন্যও এরূপ সুসংবাদ উল্লিখিত আছে।

এসব সুসংবাদ সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁদের সবার খাতেমা অর্থাৎ জীবনাবসান ঈমান ও পসন্দনীয় সৎকর্মের উপরে হবে। কেননা, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির এই ঘোষণা এ বিষয়েরই নিশ্চয়তা দেয়।

সাহাবায়ে কিরামের প্রতি দোষারোপ এবং তাঁদের ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক করা এই আয়াতের পরিপন্থী : তফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছে : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যেসব সম্মানিত ব্যক্তি সম্পর্কে ক্ষমা ও মাগফিরাতের ঘোষণা দিয়েছেন, যদি তাঁদের তরফ থেকে কোন ভুলত্রুটি অথবা গোনাহ্ হয়েও যায়, তবে এই আয়াত তাঁদের ক্ষমা ঘোষণা করছে। এমতাবস্থায় তাঁদের যে সব কর্মকাণ্ড প্রশংসার্হ ও উত্তম নয়, সে-গুলোকে আলোচনা ও বিতর্কের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা দুর্ভাগ্যজনক এবং এই আয়াতের পরিপন্থী। রাফেযী সম্প্রদায় হযরত আবূ বকর, ওমর ও অন্যান্য সাহাবীর প্রতি কুফর-নিফাকের দোষ আরোপ করে। আলোচ্য আয়াত তাদের উক্তি সুস্পষ্টভাবে খণ্ডন করে।

রিযওয়ান বৃক্ষ : আয়াতে যে বৃক্ষের উল্লেখ আছে, সেটা ছিল একটা বাবুল বৃক্ষ। কথিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের পর কিছু লোক সেখানে গমন করত এবং এই বৃক্ষের নীচে নামায আদায় করত। হযরত ফারূকে আযম (রা) দেখলেন যে, ভবিষ্যতে অজ্ঞ লোকেরা পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় এই বৃক্ষের পূজা শুরু করে দিতে পারে। এই আশংকায়

তিনি বৃক্ষটি কাটিয়ে দেন। কিন্তু বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত তারেক ইবনে আবদুর রহমান বলেনঃ আমি একবার হজ্বে যাওয়ার পথে এক জায়গায় কিছু সংখ্যক লোককে একত্রিত হয়ে নামায পড়তে দেখলাম। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলামঃ এটা কোন্ মসজিদ? তারা বললঃ এটা সেই বৃক্ষ, যার নীচে রসূলুল্লাহ্ (সা) রিযওয়ানের শপথ গ্রহণ করেছিলেন। আমি অতঃপর সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিবের কাছে উপস্থিত হয়ে এই ঘটনা বিবৃত করলাম। তিনি বললেনঃ আমার পিতা বায়'আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণ-কারীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছেনঃ আমরা যখন পরবর্তী বছর মক্কায় উপস্থিত হই, তখন অনেক খোঁজাখুঁজির পরও বৃক্ষটির সন্ধান পাইনি। অতঃপর সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব বললেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যেসব সাহাবী এই বায়'আতে শরীক ছিলেন, তাঁরা তো এই বৃক্ষের সন্ধান পাননি, আর তুমি তা জেনে ফেলেছ। আশ্চর্যের বিষয় বটে! তুমি কি তাঁদের চাইতে অধিক জ্ঞাত?---(রূহুল মা'আনী)

এ থেকে জানা গেল যে, পরবর্তীকালে লোকেরা নিছক অনুমানের মাধ্যমে কোন একটি বৃক্ষ নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল এবং তার নীচে জড়ো হয়ে নামায পড়া শুরু করেছিল। হযরত ফারূকে আযম (রা) একথাও জানতেন যে, এটা সেই বৃক্ষ নয়। তাই অবান্তর নয় যে, তিনি শিরকের আশংকা বোধ করে সেই বৃক্ষটিও কর্তন করিয়ে দেন।

খায়বর বিজয়ঃ খায়বর প্রকৃতপক্ষে বহু জনপদ, দুর্গ ও বাগ-বাগিচা সমন্বিত একটি বিশেষ এলাকার নাম।—(মাযহারী)

وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا—এই আসন্ন বিজয়ের অর্থ সর্বসম্মতভাবে খায়বর বিজয়। হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এই বিজয় বাস্তব রূপ লাভ করে। এক রেও-য়ায়েত অনুযায়ী হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় দশ দিন এবং অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী কুড়ি দিন অবস্থান করেন। এরপর খায়বরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান। ইবনে-ইসহাকের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি যিলহজ্ব মাসে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সপ্তম হিজরীর মহররম মাসে খায়বর গমন করেন। সফর মাসে খায়বর বিজিত হয়। ওয়াকেদীর মাগাযী অধ্যায়ে তাই বর্ণিত হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজারের মতে এ অভিমতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।—(মাযহারী)

মোটকথা, প্রমাণিত হল যে, খায়বর বিজয়ের ঘটনা হুদায়বিয়ার সফরের বেশ কিছু দিন পরে সংঘটিত হয়। সূরা ফাত্হ যে হুদায়বিয়ার সফরকালে অবতীর্ণ হয়েছে এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। হ্যাঁ, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, সম্পূর্ণ সূরা তখনই নাযিল হয়েছিল, না কিছু সংখ্যক আয়াত পরে নাযিল হয়েছে। প্রথমোক্ত অবস্থা সাব্যস্ত হলে আলোচ্য আয়াত-সমূহে খায়বরের আলোচনা ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে হয়েছে এবং ঘটনাটি যে অকাট্য ও নিশ্চিত —একথা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই অতীত পদবাচ্য ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে শেষোক্ত অবস্থা সাব্যস্ত হলে আলোচ্য আয়াতসমূহ পরে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا—এতে খায়বর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বোঝানো হয়েছে, যদ্দ্বারা মুসলমানদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হয়।

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ—এখানে কিয়ামত পর্যন্ত যেসব ইসলামী বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জিত হবে, সেগুলো বোঝানো হয়েছে। প্রথমোক্ত সম্পদ আল্লাহ্র নির্দেশে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য দেওয়া হয়েছিল এবং এই আয়াতে বর্ণিত সম্পদ সবার জন্য ব্যাপক। এ থেকেই জানা যায় যে, বিশেষত্বের আদেশ এসব আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি; বরং তা পৃথক ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তা কর্মে পরিণত করেন এবং সাহাবায়ে কিরামের কাছে ব্যক্ত করেন।

وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ—আয়াতে খায়বরবাসী কাফির সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এই জিহাদে অধিক শক্তি প্রদর্শনের সুযোগ দেন নি। ইমাম বগভী বলেন ঃ গাতফান গোত্র খায়বরের ইহুদীদের মিত্র ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক খায়বর আক্রমণের সংবাদ পেয়ে তারা ইহুদীদের সাহায্যার্থে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রওয়ানা হল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা চিন্তা করতে লাগল, যদি আমরা খায়বরে চলে যাই, তবে মুসলমানদের কোন লশকর আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের বাড়ীঘরে চড়াও হতে পারে। এই ভেবে তাদের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেল। —(মাযহারী)

وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا—সরল পথের আমল এবং হিদায়ত তো তাঁদের পূর্ব থেকেই অর্জিত ছিল। কিন্তু পূর্বেও বলা হয়েছে যে, হিদায়তের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এখানে সেই স্তর বোঝানো হয়েছে, যা অর্জিত ছিল না। অর্থাৎ আল্লাহ্র উপর একান্ত নির্ভরশীলতা এবং ঈমানী শক্তির বৃদ্ধি।

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে আরও অনেক বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা এখনও তাদের ক্ষমতাধীন নয়। এসব বিজয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম মক্কা বিজয় রয়েছে দেখে কোন কোন তফসীরবিদ আয়াতে মক্কা বিজয়কেই বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু ভাষা ব্যাপক হেতু কিয়ামত পর্যন্ত আগত সব বিজয়ই এর অন্তর্ভুক্ত।

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا

وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٢٢﴾ سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ
لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾ وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ
عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٢٤﴾ هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ۗ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ
وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَـُٔوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ
مَّعَرَّةٌ ۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا
لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٢٥﴾ اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ
سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى
وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٢٦﴾

(২২) যদি কাফিররা তোমাদের মুকাবিলা করত, তবে অবশ্যাই তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত। তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না। (২৩) এটাই আল্লাহ্‌র রীতি, যা পূর্ব থেকে চালু আছে। তুমি আল্লাহ্‌র রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না। (২৪) তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্‌ তা দেখেন। (২৫) তারাই তো কুফরী করেছে এবং বাধা দিয়েছে তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে এবং অবস্থানরত কুরবানীর জন্তুদেরকে যথাস্থানে পৌঁছতে। যদি মক্কায় কিছুসংখ্যক ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী না থাকত, যাদেরকে তোমরা জানতে না। অর্থাৎ তাদের পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, অতঃপর তাদের কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে, তবে সব কিছু চুকিয়ে দেওয়া হত ; কিন্তু এ কারণে চুকানো হয়নি, যাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করে নেন। যদি তারা সরে যেত, তবে আমি অবশ্যাই তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম। (২৬) কেননা, কাফিররা তাদের অন্তরে মূর্খতাযুগের জেদ পোষণ করত। অতঃপর আল্লাহ্‌

তাঁর রসূল ও মু'মিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের জন্য সংযমের বাক্য অপরিহার্য করে দিলেন। বস্তুত তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যেহেতু কাফিরদের পরাজিত হওয়ার সঙ্গত কারণ বিদ্যমান ছিল, যা পরে বর্ণিত হবে, সেহেতু) যদি এই সন্ধি না হত ; বরং) কাফিররা তোমাদের মুকাবিলা করত, তবে (সেসব কারণবশত) অবশ্যই তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত ; অতঃপর তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না। আল্লাহ্ (কাফিরদের জন্য) এই রীতিই করে রেখেছেন, যা পূর্ব থেকে চালু আছে (যে, মুকাবিলায় সত্যপন্থীরা জয়ী ও মিথ্যাপন্থীরা পরাজিত হয়। কখনও কোন রহস্য ও উপযোগিতার কারণে এতে বিলম্ব হওয়া এর পরিপন্থী নয়)। আপনি আল্লাহ্র রীতিতে (কোন ব্যক্তির তরফ থেকে) কোন পরিবর্তন পাবেন না (যে, আল্লাহ্ কোন কাজ করতে চাইবেন এবং কেউ তা হতে দেবে না)। তিনিই তাদের হাতকে তোমাদের থেকে (অর্থাৎ তোমাদেরকে হত্যা করা থেকে) এবং তোমাদের হাতকে তাদের (হত্যা) থেকে মক্কায় (অর্থাৎ মক্কার অদূরে হুদায়বিয়ায়) নিবারিত করেছেন তোমাদেরকে তাদের উপর জয়ী করার পর। [এখানে সূরার শুরুতে উল্লিখিত হুদায়বিয়ার কাহিনীর অষ্টম অংশে বর্ণিত ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম কোরাইশদের পঞ্চাশ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছিলেন। এছাড়া আরও কিছু লোক গ্রেফতার হয়ে মুসলমানদের অধিকারে চলে এসেছিল। তখন মুসলমানরা যদি তাদেরকে হত্যা করত, তবে অপরদিকে মক্কায় আটক হযরত ওসমান গনি (রা) ও কিছুসংখ্যক মুসলমানকেও কাফিররা হত্যা করে দিত। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়া। যদিও উল্লিখিত প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা একথাও বলে দিয়েছেন যে, যুদ্ধ হলেও বিজয় মুসলমানের হত, তথাপি আল্লাহ্র জ্ঞানে তখন যুদ্ধ না হওয়ার মধ্যেই মুসলমানদের বৃহত্তম স্বার্থ নিহিত ছিল। তাই এদিকে কাফির বন্দীদেরকে হত্যা না করার বিষয়টি মুসলমানদের অন্তরে জাগরিত করে দিলেন। এখানে মুসলমানদের হাত তাদের হত্যা থেকে নিবারিত করলেন। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলা কোরাইশদের অন্তরে মুসলমানদের ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা সন্ধির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সোহায়েলকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে পাঠিয়ে দিল। এভাবে প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধ না হওয়ার দ্বিমুখী ব্যবস্থা সম্পন্ন করলেন]। তোমরা যা করছিলে, আল্লাহ্ (তখন) তা দেখছিলেন (এবং তিনি তোমাদের কাজের পরিণতি জানতেন। তাই যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার মত কোন কাজ হতে দেন নি। এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যুদ্ধ হলে কাফিররা কিভাবে এবং কেন পরাজিত হত) তারাই তো কুফরী করেছে এবং তোমাদেরকে (ওমরা করার জন্য) মসজিদে-হারামে উপস্থিতি থেকে বাধা দিয়েছে। (এখানে মসজিদে-হারাম এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী সাঈর দূরত্ব এ উভয়কে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তওয়াফ যেহেতু আমল ও সর্বপ্রথম এবং তা মসজিদে-হারামে সম্পন্ন হয়, তাই শুধু মসজিদে-হারাম থেকে বাধা দেওয়ার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে) এবং (হুদায়বিয়ায়) অবস্থানরত কুরবানীর জন্তুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতে বাধা দিয়েছে। জন্তু কুরবানীর

স্থান হচ্ছে মিনা। তারা জন্তুগুলোকে মিনা পর্যন্ত পৌঁছতে দেয়নি। তাদের এহেন অপরাধ এবং পবিত্র হেরেমে বসে এহেন জুলুম করার দাবী ছিল এই যে, মুসলমানদেরকে যুদ্ধের আদেশ দিয়ে তাদেরকে পর্যুদস্ত করে দেওয়া হোক। কিন্তু কোন কোন রহস্য এই দাবী পূরণের পথে অন্তরায় হয়ে যায়। তন্মধ্যে একটি রহস্য ছিল এই যে, তখন মক্কায় অনেক মুসলমান কাফিরদের হাতে বন্দী ও নির্যাতিত ছিল। হুদায়বিয়ার কাহিনীর দশম অংশে তা উল্লেখ করা হয়েছে এবং আবু জন্দলের ফরিয়াদের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। তখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে অজ্ঞাতসারে এসব মুসলমানও ক্ষতিগ্রস্ত হত এবং স্বয়ং মুসলমানদের হাতেই তাদের নিহত হওয়ার আশংকা ছিল। ফলে সাধারণ মুসলমানগণ তাতে দুঃখিত ও অনুতপ্ত হত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধ না হওয়ার পক্ষে পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিলেন। পরবর্তী আয়াতে এই বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে)। যদি (মক্কায় তখন) অনেক মুসলমান পুরুষ এবং মুসলমান নারী না থাকত, যাদেরকে তোমরা জানতে না। অর্থাৎ তাদের পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, অতঃপর তাদের কারণে তোমরাও দুঃখিত, অনুতপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত না হতে, তবে সব কিস্সা চুকিয়ে দেওয়া হত; কিন্তু এ কারণে চুকানো হয়নি, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করে নেন। (সেমতে যুদ্ধ না হওয়ার ফলে সেই মুসলমানগণ বেঁচে গেছে এবং তোমরা তাদেরকে হত্যা করার পরিতাপ থেকে মুক্ত রয়ে গেছ। তবে) যদি তারা (অর্থাৎ আটক মুসলমানরা মক্কা থেকে কোথাও) সরে যেত, তবে (মক্কাবাসীদের মধ্যে) যারা কাফির, আমি তাদেরকে (মুসলমানদের হাতে) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম। (এই কাফিরদের পর্যুদস্ত ও নিহত হওয়ার আরও একটি কারণ ছিল) কেননা, কাফিররা তাদের অন্তরে জেদ পোষণ করত---মূর্খতা যুগের জেদ। (এই জেদ বলে বিসমিল্লাহ্ ও রসূল শব্দ লেখার বেলায় তাদের বাধাদানকে বোঝানো হয়েছে। উপরে হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রের বর্ণনায় একথা উল্লিখিত হয়েছে) অতএব (এর ফলে মুসলমানদের উত্তেজিত হয়ে তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়াই সঙ্গত ছিল; কিন্তু) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল ও মু'মিনদের নিজের পক্ষ থেকে সহনশীলতা দান করলেন। (ফলে তাঁরা উপরোক্ত বাক্য লিপিবদ্ধ করতে পীড়াপীড়ি করলেন না এবং সন্ধি হয়ে গেল) এবং (তখন) আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে তাকওয়ার বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখলেন। তাকওয়ার বাক্য বলে কালেমায়ে-তাই-য়্যেবা অর্থাৎ তওহীদ ও রিসালতের স্বীকারোক্তি বোঝানো হয়েছে। তার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার অর্থ এই যে, তওহীদ ও রিসালতে বিশ্বাস করার ফল হচ্ছে আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য। মানসিক উত্তেজনার বিপরীতে মুসলমানরা যে সংযম ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিল, তার একমাত্র কারণ ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আদেশ। এহেন কঠিন উত্তেজনাকর মুহূর্তে রসূল (সা)-এর আনুগত্যকেই তাকওয়ার বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা বলা হয়েছে। বস্তুত তারাই (মুসলমানরাই) এর (অর্থাৎ তাকওয়ার বাক্যের দুনিয়াতেও) অধিক যোগ্য। (কারণ, তাদের অন্তরে সত্যের অন্বেষা রয়েছে। এই অন্বেষাই ঈমান পর্যন্ত পৌঁছায়) এবং (পরকালেও) এর (সওয়াবের) উপযুক্ত। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

بِبَطْنِ مَكَّةَ—এর আসল অর্থ মক্কা শহরই; কিন্তু এখানে হুদায়বিয়ার স্থান

বোঝানো হয়েছে। মক্কার সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ার কারণে হুদায়বিয়াকেই **'বাতনে মক্কা'** বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের আলিমগণ হুদায়বিয়ার কিছু অংশকে হেরেমের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। এই আয়াত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ

এ থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার পর মক্কা প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়, কুরবানী করে ইহ্‌রাম থেকে হালাল হওয়া তার পক্ষে অপরিহার্য। এতে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, এই কুরবানী বাধাপ্রাপ্তির স্থানেই হতে পারে, না অন্যান্য কুরবানীর ন্যায় এর জন্যও হেরেমের অভ্যন্তরে হওয়া শর্ত? হানাফীদের মতে এর জন্যই হেরেমের সীমানা শর্ত। আলোচ্য আয়াত তাদের প্রমাণ। এখানে এই কুরবানীর জন্য কোরআন একটি বিশেষ স্থান সাব্যস্ত করেছে, যেখানে পৌঁছতে কাফিররা মুসলমানদেরকে বাধা দিয়েছিল। এখানে কথা থাকে এই যে, খোদ হানাফী আলিমগণ একথাও বলেন যে, হুদায়বিয়ার কতক অংশ হেরেমের অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় হেরেমে প্রবেশে বাধাদান কিরূপে প্রমাণিত হয়? জওয়াব এই যে, যদিও এই কুরবানী হেরেমের যে কোন অংশে করে দেওয়া যথেষ্ট; কিন্তু মিনার অভ্যন্তরে 'মানহার' (কোরবানগাহ্) নামে যে বিশেষ স্থান রয়েছে, সেখানে কুরবানী করা উত্তম। কাফিররা তখন মুসলমানদেরকে এই উত্তম স্থানে জন্তু নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিল।

فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ—مَعَرَّةٌ শব্দের অর্থ কেউ কেউ গোনাহ্ বর্ণনা করেছেন, কেউ সাধারণ ক্ষতি এবং কেউ দোষ বর্ণনা করেছেন। এ স্থলে শেষোক্ত অর্থই বাহ্যত সঙ্গত। কারণ, যদি যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত এবং অজ্ঞাতসারে মুসলমানদের হাতে মক্কায় আটক মুসলমানগণ নিহত হত, তবে এটা একটা দোষ ও লজ্জাকর ব্যাপার হত। কাফিররা মুসলমানদেরকে লজ্জা দিত যে, তোমরা তোমাদের দীনী ভাইদেরকে হত্যা করেছ। এ ছাড়া এটা ক্ষতিকর ব্যাপারও ছিল। নিহত মুসলমানদের ক্ষতি বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। হত্যাকারী মুসলমানগণও অনুতাপ ও আক্ষেপের অনলে দগ্ধ হত।

সাহাবায়ে কিরামকে দোষত্রুটি থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা: ইমাম কুরতুবী বলেন: অজ্ঞাতসারে এক মুসলমানের হাতে অন্য মুসলমান মারা যাওয়া গোনাহ্ তো নয়; কিন্তু দোষ, লজ্জা, অনুতাপ ও আক্ষেপের কারণ অবশ্যই। ভুলবশত হত্যার কারণে রক্তপণ ইত্যাদি দেওয়ারও বিধান আছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল (সা)-এর সাহাবীদেরকে এ থেকেও নিরাপদ রেখেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, সাহাবায়ে কিরাম যদিও পয়গম্বরগণের ন্যায় নিষ্পাপ নন, কিন্তু সাধারণভাবে তাঁদেরকে ভুলভ্রান্তি ও দোষ থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা হয়ে যায়। এটাই তাঁদের সাথে আল্লাহ্‌র ব্যবহার।

لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এই ক্ষেত্রে মুসলমানদের অন্তরে সংযম সৃষ্টি করে যুদ্ধ না হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কারণ আল্লাহ্

জানতেন যে, ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। তাদের প্রতি এবং মক্কায় আটক মুসলমানদের প্রতি রহমত করার জন্য এসব আয়োজন করা হয়েছে।

لَوْ تَزَيَّلُوا—تَزَيُّل শব্দের আসল অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মক্কায় আটক মুসলমানগণ যদি কাফিরদের থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হত এবং মুসলমানগণ তাদেরকে চিনে বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিতে পারত, তবে এই মুহূর্তেই কাফিরদেরকে মুসলমানদের হাতে শাস্তি প্রদান করা হত। কিন্তু মুশকিল এই যে, আটক দুর্বল মুসলমান পুরুষ ও নারী কাফিরদের মধ্যেই মিশ্রিত ছিল। যুদ্ধ হলে তাদেরকে বাঁচানোর উপায় ছিল না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধই মওকুফ করে দিলেন।

وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا—'কলেমায়ে-তাকওয়া' বলে তাকওয়া অবলম্বনকারীদের কলেমা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তওহীদ ও রিসালতের কলেমা। এই কলেমাই তাকওয়ার ভিত্তি। তাই একে কলেমায়ে-তাকওয়া বলা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামকে এই কলেমার অধিক যোগ্য ও উপযুক্ত আখ্যা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সেসব লোকের লাঞ্ছনা প্রকাশ করে দিয়েছেন, যারা তাঁদের প্রতি কুফর ও নিফাকের দোষ আরোপ করে। আল্লাহ্ তো তাঁদেরকে কলেমায়ে ইসলামের অধিক যোগ্য বলেন আর এই হতভাগারা তাঁদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে।

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ
فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ
عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي
التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ

فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ
وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾

(২৭) আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে-হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তকমুণ্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। তোমরা কাউকে ভয় করবে না। অতঃপর তিনি জানেন যা তোমরা জান না। এ ছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিজয়। (২৮) তিনিই তাঁর রসূলকে হিদায়ত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠাতারূপে আল্লাহ্ যথেষ্ট। (২৯) মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকূ ও সিজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন। তওরাতে তাদের অবস্থা এরূপই এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারাগাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে ---চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে---যাতে আল্লাহ্ তাদের দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন, যা বাস্তবের অনুরূপ। ইন্শাআল্লাহ্ তোমরা অবশ্যই মসজিদে-হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে, তোমাদের কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডিত করবে এবং কেউ কেউ কর্তন করবে। (সেমতে পরবর্তী বছর তাই হয়েছে। এ বছর এরূপ না হওয়ার কারণ এই যে) আল্লাহ্ সেসব বিষয়-(ও রহস্য) জানেন, যা তোমরা জান না। (তন্মধ্যে একটি রহস্য এই যে) এর (অর্থাৎ এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার) আগে তোমাদেরকে (খায়বরের) একটি আসন্ন বিজয় দিয়েছেন (যাতে তদ্দ্বারা মুসলমানদের শক্তি ও সাজসরঞ্জাম অর্জিত হয়ে যায় এবং তারা নিশ্চিন্তে ওমরা পালন করতে পারে। বাস্তব তাই হয়েছে) তিনিই তাঁর রসূলকে হিদায়ত (অর্থাৎ কোরআন) ও সত্য দীন (ইসলাম) সহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে (অর্থাৎ ইসলামকে) অন্য সব ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। (এই জয় প্রমাণ ও দলীলের দিক দিয়ে তো চিরকাল অক্ষয় থাকবে এবং শান-শওকত ও রাজত্বের দিক দিয়েও একটি শর্ত সহকারে প্রাধান্য থাকবে। শর্তটি এই যে, এই ধর্মাবলম্বীরা অর্থাৎ মুসলমানরা যদি যোগ্যতাসম্পন্ন হয়। এই শর্তের অনুপস্থিতিতে বাহ্যিক জয়ের ওয়াদা নেই। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এই শর্ত বিদ্যমান ছিল। তাঁদের সাথে সম্পর্কযুক্ত পরবর্তী আয়াতে এই যোগ্যতার উল্লেখ আছে। তাই এই আয়াত একদিকে যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালতের সুসংবাদ আছে, তেমনি অপরদিকে সাহাবায়ে কিরামের

জন্য বিজয় লাভেরও সুসংবাদ আছে। বাস্তবে তাই প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের পর পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত না হতেই ইসলাম ও কোরআন বিজয়ীবেশে বিশ্বের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়েছে। মূর্খতা যুগের জেদ পোষণকারীরা যদি আপনার নামের সাথে 'রসূল' শব্দ সংযুক্ত করে লিখতে অসম্মত হয়, তবে আপনি দুঃখ করবেন না। কেননা, আপনার রিসালতের) সাক্ষ্যদাতা হিসাবে আল্লাহ্ যথেষ্ট। (তিনি আপনার রিসালতকে সুস্পষ্ট যুক্তি ও প্রকাশ্য মো'জেযার মাধ্যমে সপ্রমাণ করে দেখিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে) মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল। [এখানে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'—এই পূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মূর্খতা যুগের জেদ পোষণকারীরা আপনার নামের সাথে 'রসূলুল্লাহ্' লিখতে পছন্দ না করলে তাতে কি আসে যায়, আল্লাহ্ এই বাক্য আপনার নামের সাথে লিখে দিয়েছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনুসারী সাহাবায়ে কিরামের গুণাবলী ও সুসংবাদ উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ] যারা সংসর্গপ্রাপ্ত, (এতে দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন সংসর্গপ্রাপ্ত সকল সাহাবীই দাখিল আছেন। যারা হুদায়বিয়ায় তাঁর সহচর ছিলেন, তাঁরা বিশেষভাবে এই আয়াতের উদ্দেশ্য। মতলব এই যে, সকল সাহাবায়ে কিরামই এসব গুণে গুণান্বিত)। তাঁরা কাফিরদের বিরুদ্ধে বজ্রকঠোর (এবং) নিজেদের মধ্যে পরস্পরে সহানুভূতিশীল। (হে পাঠক) তুমি তাদেরকে দেখবে যে, কখনও রুকূ করছে, কখনও সিজদা করছে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করছে। তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন প্রস্ফুটিত। (এই চিহ্ন দ্বারা খুশু-খুযু তথা বিনয় ও নম্রতার উজ্জ্বল আভা বোঝানো হয়েছে, যা মু'মিন ও পরহিযগার লোকদের চেহারায় প্রস্ফুটিত হতে দেখা যায়।) এগুলো (অর্থাৎ তাদের এই গুণাবলী) তওরাতে আছে এবং ইঞ্জিলে তাদের এই গুণ (উল্লিখিত) রয়েছে, যেমন একটি চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর (মৃত্তিকা, পানি, বায়ু ইত্যাদি থেকে খাদ্য লাভ করে) তা শক্ত ও মজবুত হয়, অতঃপর আরও মোটা হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায়, (সবুজ ও সতেজ হওয়ার কারণে) চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে (এমনিভাবে সাহাবীদের মধ্যে প্রথমে দুর্বলতা ছিল। এরপর প্রত্যহ শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবায়ে কিরামকে এই ক্রমোন্নতি এজন্য দান করেছেন) যাতে (তাদের এ অবস্থা দ্বারা) কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ্ (পরকালে) তাদেরকে (গোনাহের) ক্ষমা এবং (ইবাদতের কারণে) মহা পুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হুদায়বিয়ার সন্ধি চূড়ান্ত হয়ে গেলে একথা স্থির হয়ে যায় যে, এখন মক্কায় প্রবেশ এবং ওমরা পালন ব্যতিরেকেই মদীনায় ফিরে যেতে হবে। বলা বাহুল্য, সাহাবায়ে কিরাম ওমরা পালনের সংকল্প রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে করেছিলেন, যা এক প্রকার ওহী ছিল। এখন বাহ্যত এর বিপরীত হতে দেখে কারও কারও অন্তরে এই সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল যে, (নাউযুবিল্লাহ্) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বপ্ন সত্য হল না। অপরদিকে কাফির-মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে বিদ্রূপ করল যে, তোমাদের রসূলের স্বপ্ন সত্য

নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ —আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। —(বায়হাকী)

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ —صدق শব্দটি كذب -এর বিপরীতে কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়। যে কথা বাস্তবের অনুরূপ, তাকে صدق এবং যে কথা অনুরূপ নয়, তাকে كذب বলা হয়। মাঝে মাঝে কাজকর্মের জন্যও এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। তখন এর অর্থ হয় কোন কাজকে বাস্তবায়িত করা; যেমন কোরআনে আছেঃ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ অর্থাৎ তারা তাদের অঙ্গীকারকে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছে।

এ সময় صدق শব্দের দু'টি مفعول থাকে; যেমন আলোচ্য আয়াতে প্রথম مفعول হচ্ছে رسوله এবং দ্বিতীয় مفعول হচ্ছে رؤيا—আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে স্বপ্নের ব্যাপারে সাচ্চা দেখিয়েছেন।—(বায়যাভী) যদিও এই সাচ্চা দেখানোর ঘটনা ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়ার ছিল; কিন্তু একে অতীত শব্দবাচ্য ব্যক্ত করে এর নিশ্চিত ও অকাট্য হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেমতে পরবর্তী বাক্যে ভবিষ্যৎ পদবাচ্য ব্যবহার করে বলা হয়েছেঃ

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ —অর্থাৎ মসজিদে-হারামে প্রবেশ সংক্রান্ত আপনার স্বপ্ন অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে; কিন্তু এ বছর নয়—এ বছরের পরে। স্বপ্নে মসজিদে-হারামে প্রবেশের সময় নির্দিষ্ট ছিল না। পরম ঔৎসুক্যবশত সাহাবায়ে কিরাম এ বছরই সফরের সংকল্প করে ফেলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাঁদের সাথে যোগ দিলেন। এতে আল্লাহ্ তা'আলার বিরাট রহস্য নিহিত ছিল, যা হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। সেমতে সিদ্দীকে আকবর (রা) প্রথমেই হযরত ওমর (রা)-এর জওয়াবে বলেছিলেনঃ আপনার সন্দেহ করা উচিত নয়, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বপ্নে কোন সময় ও বছর নির্দিষ্ট ছিল না। এখন না হলে পরে হবে।—(কুরতুবী)

ভবিষ্যৎ কাজের জন্য 'ইনশাআল্লাহ্' বলার তাকীদঃ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মসজিদে-হারামে প্রবেশের সাথে—যা ভবিষ্যতে হওয়ার ছিল—'ইনশাআল্লাহ্' শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ আল্লাহ্ নিজের চাওয়া সম্পর্কে নিজেই জ্ঞাত। তাঁর এরূপ বলার প্রয়োজন ছিল না কিন্তু স্বীয় রসূল ও বান্দাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এ স্থানে আল্লাহ্ তা'আলাও 'ইনশাআল্লাহ্' শব্দ ব্যবহার করেছেন।—(কুরতুবী)

مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ — সহীহ্ বুখারীতে আছে, পরবর্তী বছর কাযা ওমরায় হযরত মুয়াবিয়া (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্র কেশ কাঁচি দ্বারা কর্তন করেছিলেন।

এটা কাযা ওমরারই ঘটনা। কেননা, বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ্ (সা) মস্তক মুণ্ডিত করেছিলেন। ---(কুরতুবী)

فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا—অর্থাৎ এ বছরই তোমাদেরকে মসজিদে-হারামে প্রবেশ এবং ওমরাহ্ করিয়ে দিতে আল্লাহ্ তা'আলা সক্ষম ছিলেন। পরবর্তী বছর পর্যন্ত বিলম্বিত করার মধ্যে বড় বড় রহস্য নিহিত ছিল, যা আল্লাহ্ জানতেন---তোমরা জানতে না। তন্মধ্যে এক রহস্য এটাও ছিল যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল খায়বর বিজিত হয়ে মুসলমানদের শক্তি ও সাজসরঞ্জাম বর্ধিত হোক এবং তারা পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশান্তি সহকারে ওমরা পালন করুক। এ কারণেই বলা হয়েছে ঃ فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا—অর্থাৎ স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করার আগে খায়বরের আসন্ন বিজয় মুসলমানগণ লাভ করুক। কেউ কেউ বলেন, এই আসন্ন বিজয় বলে খোদ হুদায়বিয়ার সন্ধি বোঝানো হয়েছে। কারণ, এটাতে মক্কা বিজয় ও অন্যান্য সব বিজয়ের ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালে সকল সাহাবীই একে বৃহত্তম বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এ বছর তোমাদের সফরের সংকল্প করার পর ওমরা পালনে ব্যর্থতা ও সন্ধি সম্পাদনের মধ্যে যেসব রহস্য লুক্কায়িত ছিল, তা তোমাদের জানা ছিল না ; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সব জানতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, এই স্বপ্নের ঘটনার আগে হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে তোমাদেরকে একটা আসন্ন বিজয় দান করবেন। এই আসন্ন বিজয়ের ফলাফল সবাই প্রত্যক্ষ করেছে যে, হুদায়বিয়ার সফরে মুসলমানদের সংখ্যা দেড় হাজারের বেশী ছিল না। সন্ধির পর তাদের সংখ্যা দশ হাজারে উন্নীত হয়ে গেল।---(কুরতুবী)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ—পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বিজয়, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা এবং বিশেষভাবে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী সাহাবী ও সাধারণভাবে সকল সাহাবীর গুণাবলী ও সুসংবাদ উল্লিখিত হয়েছে। এখন সূরার উপ-সংহারে সেসব বিষয়বস্তুর সারমর্ম বর্ণনা করা হচ্ছে। এসব নিয়ামত ও সুসংবাদ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আনুগত্য ও সত্যায়নের কারণেই প্রদত্ত হয়েছে। তাই এই সত্যায়ন ও আনুগত্যের উপর জোর দেওয়ার জন্য, রিসালত অস্বীকারকারীদের যুক্তি খণ্ডন করার জন্য এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মুসলমানদের অন্তরে যেসব সন্দেহ পুঞ্জীভূত হয়েছিল, সেগুলো দূরীকরণের জন্য আলোচ্য আয়াতসমূহে রিসালত সপ্রমাণ করা হয়েছে এবং জগতের সব ধর্মের উপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দীনকে জয়যুক্ত করার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ—সমগ্র কোরআনে শেষ নবী (সা)-র নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে সাধারণত গুণাবলী ও পদবীর মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ঃ

বিশেষত আহ্বানের স্থলে يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ - يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ইত্যাদি বলা হয়েছে। এর বিপরীতে অপরাপর পয়গম্বরকে নাম সহকারে আহ্বান করা হয়েছে ; যেমন يَا عِيْسٰى - يَا مُوْسٰى - يَا اِبْرَاهِيْمُ সমগ্র কোরআনে মাত্র চার জায়গায় তাঁর নাম 'মুহাম্মদ' উল্লেখ করা হয়েছে। এসব স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ করার মধ্যে উপযোগিতা এই যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে হযরত আলী (রা) যখন তাঁর নাম 'মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ্' লিপিবদ্ধ করেন, তখন কাফিররা এটা মিটিয়ে 'মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্' লিপিবদ্ধ করতে পীড়াপীড়ি করে। রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র আদেশে তাই মেনে নেন। পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'আলা এ স্থলে বিশেষভাবে তাঁর নামের সাথে 'রাসূলুল্লাহ্' শব্দ কোরআনে উল্লেখ করে একে চিরস্থায়ী করে দিলেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত লিখিত ও পঠিত হবে।

وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ—এখান থেকে সাহাবায়ে কিরামের গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছে। যদিও এতে সর্বপ্রথম হুদায়বিয়া ও বায়'আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে ; কিন্তু ভাষার ব্যাপকতার দরুন সকল সাহাবীই এতে দাখিল আছেন। কেননা, সবাই তাঁর সহচর ও সঙ্গী ছিলেন।

সাহাবায়ে কিরামের গুণাবলী, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ লক্ষণাদি ঃ এ স্থলে আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালত ও তাঁর দীনকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করার কথা বর্ণনা করে সাহাবায়ে কিরামের গুণাবলী, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ লক্ষণাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। এতে একদিকে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় গৃহীত তাঁদের কঠোর পরীক্ষার পুরস্কার আছে। কেননা, অন্তরগত বিশ্বাস ও প্রেরণার বিরুদ্ধে সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার ফলে ওমরা পালনে ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাঁদের এতটুকু পদস্খলন হয়নি বরং তাঁরা নজিরবিহীন আনুগত্য ও ঈমানী শক্তির পরিচয় দেন। এছাড়া সাহাবায়ে কিরামের গুণাবলী ও লক্ষণাদি বিস্তারিত বর্ণনা করার মধ্যে এ রহস্য নিহিত থাকাও বিচিত্র নয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পর দুনিয়াতে আর কোন নবী-রসূল প্রেরিত হবেন না। তিনি উম্মতের জন্য কোরআনের সাথে সাহাবীদেরকে নমুনা হিসাবে ছেড়ে যাবেন এবং তাঁদের অনুসরণ করার আদেশ দেবেন। তাই কোরআনও তাঁদের গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে তাঁদের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ স্থলে সাহাবায়ে কিরামের সর্বপ্রথম যে গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই যে, তাঁরা কাফিরদের মুকাবিলায় বজ্র-কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরে সহানুভূতিশীল। কাফিরদের মুকাবিলায় তাঁদের কঠোরতা সর্বক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়েছে। তাঁরা ইসলামের জন্য বংশগত সম্পর্ক বিসর্জন দিয়েছেন। হুদায়বিয়ার ঘটনায় বিশেষভাবে এর বিকাশ ঘটেছে। সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক সহানুভূতি ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তখন প্রকাশ পেয়েছে, যখন মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আনসাররা তাঁদের সবকিছুতে মুহাজিরদেরকে অংশীদার করার আহ্বান জানায়। কোরআন

সাহাবায়ে কিরামের এই গুণটি সর্বপ্রথম বর্ণনা করেছে। কেননা, এর সারমর্ম এই যে, তাঁদের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, ভালবাসা অথবা হিংসাপরায়ণতা কোন কিছুই নিজের জন্য নয়; বরং সব আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলের জন্য হয়ে থাকে। এটাই পূর্ণ ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর। সহীহ্ বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আছে ঃ من احب لله و ابغض لله فقد استكمل ايمانه অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার ভালবাসা ও শত্রুতা উভয়কে আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুগামী করে দেয়, সে তার ঈমানকে পূর্ণতা দান করে। এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরাম কাফিরদের মুকাবিলায় কঠোর ছিলেন---এ কথার অর্থ এরূপ নয় যে, তাঁরা কোন সময় কোন কাফিরের প্রতি দয়া করেন না; বরং অর্থ এই যে, যে স্থলে আল্লাহ্ ও রসূলের পক্ষ থেকে কাফিরদের প্রতি কঠোরতা করার আদেশ হয়, সেই স্থলে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ইত্যাদি সম্পর্ক এ কাজে অন্তরায় হয় না। পক্ষান্তরে দয়া-দাক্ষিণ্যের ব্যাপারে তো স্বয়ং কোরআনের ফয়সালা এই যে ঃ

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ —— اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ—অর্থাৎ যেসব কাফির মুসলমানদের বিপক্ষে কার্যত যুদ্ধরত নয়, তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করতে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেন না। রসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের অসংখ্য ঘটনা এমন পাওয়া যায়, যেগুলোতে দুর্বল, অক্ষম অথবা অভাবগ্রস্ত কাফিরদের সাথে দয়া-দাক্ষিণ্য-মূলক ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে ন্যায় ও সুবিচারের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপক আদেশ রয়েছে। এমনকি, রণাঙ্গনেও ন্যায় ও ইনসাফের পরিপন্থী কোন কার্যক্রম ইসলামে বৈধ নয়।

সাহাবায়ে কিরামের দ্বিতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা সাধারণত রুকূ-সিজদা ও নামাযে মশগুল থাকেন। তাঁদেরকে অধিকাংশ সময় এ কাজেই লিপ্ত পাওয়া যায়। প্রথম গুণটি পূর্ণ ঈমানের আলামত এবং দ্বিতীয় গুণটি পূর্ণ আমলের পরিচায়ক। কারণ, আমল-সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে নামায। سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ অর্থাৎ নামায তাঁদের জীবনের এমন ব্রত হয়ে গেছে যে, নামায ও সিজদার বিশেষ চিহ্ন তাঁদের মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হয়। এখানে 'সিজদার চিহ্ন' বলে সেই নূরের আভা বোঝানো হয়েছে, যা দাসত্ব এবং বিনয় ও নম্রতার প্রভাবে প্রত্যেক ইবাদতকারীর মুখমণ্ডলে প্রত্যক্ষ করা হয়। কপালে সিজদার কাল দাগ বোঝানো হয়নি। বিশেষত তাহাজ্জুদ নামাযের ফলে উপরোক্ত চিহ্ন খুব বেশী ফুটে উঠে। ইবনে মাজার এক রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ من كثر صلوته بالليل حسن وجهه بالنهار অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাত্রে বেশী নামায পড়ে, দিনের বেলায় তার চেহারা সুন্দর আলোকোজ্জ্বল দৃষ্টিগোচর হয়। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ এর অর্থ নামাযীদের মুখমণ্ডলের সেই নূর, যা কিয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে।

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ

উপরে সাহাবায়ে কিরামের সিজদা ও নামাযের যে আলামত বর্ণনা করা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাঁদের এই দৃষ্টান্তই তওরাতে বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যে, ইঞ্জিলে তাঁদের আরও একটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হয়েছে। তা এই যে, তাঁরা এমন, যেমন কোন কৃষক মাটিতে বীজ বপন করে। প্রথমে এই বীজ একটি ক্ষুদ্র সূচের আকারে নির্গত হয়। এরপর তা থেকে ডালপালা অঙ্কুরিত হয়। অতঃপর তা আরও মজবুত ও শক্ত হয় এবং অবশেষে শক্ত কাণ্ড হয়ে যায়। এমনিভাবে নবী করীম (সা)-এর সাহাবীগণ শুরুতে খুবই নগণ্য সংখ্যক ছিলেন। এক সময়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যতীত মাত্র তিনজন মুসলমান ছিলেন—পুরুষদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা), নারীদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রা) ও বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রা)। এরপর আস্তে আস্তে তাঁদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এমন কি, বিদায় হজ্জের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে হজ্জে অংশগ্রহণকারী সাহাবী-দের সংখ্যা দেড় লক্ষের কাছাকাছি বর্ণনা করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে ঃ এক. فِى التَّوْرٰىةِ এ পাঠবিরতি করা এবং মুখমণ্ডলের নূরের দৃষ্টান্ত তওরাতের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা। এরপর مَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ—এ পাঠবিরতি না করা তখন অর্থ এই হবে যে, সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টান্ত সেই চারাগাছের ন্যায়, যা শুরুতে খুবই দুর্বল হয়। এরপর আস্তে আস্তে শক্ত কাণ্ড-বিশিষ্ট হয়ে যায়।

দুই. فِى التَّوْرٰىةِ এ পাঠবিরতি না করা, বরং فى الانجيل এ পাঠবিরতি করা। অর্থ এই হবে যে, মুখমণ্ডলের নূরের দৃষ্টান্ত তওরাতেও রয়েছে, ইঞ্জীলেও রয়েছে। অতঃপর كَزَرْعٍ-কে একটি আলাদা দৃষ্টান্ত সাব্যস্ত করা। তিন. فى التورٰة এ বাক্য না করা এবং فى الانجيل এও শেষ না করা। অতঃপর ذٰلك-কে পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের দিকে ইঙ্গিত সাব্যস্ত করা। এর অর্থ এই যে, তওরাত ও ইঞ্জীল উভয়ের মধ্যে সাহাবীগণের দৃষ্টান্ত চারাগাছের ন্যায়। বর্তমান যুগে তওরাত ও ইঞ্জীল আসল আকারে বিদ্যমান থাকলে সেগুলো দেখলেই কোরআনের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এগুলোতে বহু বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। তাই কোন নিশ্চিত ফয়সালা সম্ভবপর নয়। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদ প্রথম সম্ভাবনাকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন, যা থেকে জানা যায় যে, প্রথম দৃষ্টান্ত তওরাতে এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ইঞ্জীলে আছে। ইমাম বগভী (র) বলেন ঃ ইঞ্জীলে

সাহাবায়ে কিরামের এই দৃষ্টান্ত আছে যে, তাঁরা শুরুতে নগণ্য সংখ্যক হবেন, এরপর তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং শক্তি অর্জিত হবে। হযরত কাতাদাহ্ (র) বলেনঃ সাহাবায়ে কিরামের এই দৃষ্টান্ত ইঞ্জীলে লিখিত আছে যে, এমন একটি জাতির অভ্যুদয় হবে, যারা চারাগাছের অনুরূপ বেড়ে যাবে। তারা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে। (মাযহারী) বর্তমান যুগের তওরাত ও ইঞ্জীলেও অসংখ্য পরিবর্তন সত্ত্বেও নিম্নরূপ ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান রয়েছেঃ

খোদাওন্দ সিনা থেকে আগমন করলেন এবং শায়ীর থেকে তাদের কাছে যাহির হলেন। তিনি ফারান পর্বত থেকে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং দশ হাজার পবিত্র লোক তাঁর সাথে আসলেন। তাঁর হাতে তাদের জন্য একটি অগ্নিদীপ্ত শরীয়ত ছিল। তিনি নিজের লোকদেরকে খুব ভালবাসেন। তাঁর সব পবিত্র লোক তোমার হাতে আছে এবং তোমার চরণের কাছে উপবিষ্ট আছে। তারা তোমার কথা মানবে। —(তওরাত ঃ বাবে এস্তেস্না)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের সময় সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। তাঁরা ফারান থেকে উদিত দীপ্তিময় মহাপুরুষের সাথে 'খলীলুল্লাহ্' শহরে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর হাতে অগ্নিদীপ্ত শরীয়ত থাকবে বলে أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ —এর প্রতি ইঙ্গিত বোঝা যায়। তিনি নিজের লোকদেরকে ভালবাসবেন—কথা থেকে رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ এর বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। ইযহারুল-হক, তৃতীয় খণ্ড, অষ্টম অধ্যায়ে এর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই গ্রন্থটি মওলানা রহমতুল্লাহ্ কিরানভী (র) খৃস্টান মতবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করার জন্য ফিল্ডার নামক পাদ্রীর জওয়াবে লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে ইঞ্জীলে বর্ণিত দৃষ্টান্ত এভাবে উল্লেখ করা হয়েছেঃ সে তাদের সামনে আরও একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে বলল, আকাশের রাজত্ব সরিষার দানার মত, যাকে কেউ ক্ষেতে বপন করে। এটা ক্ষুদ্রতম বীজ হলেও যখন বেড়ে যায়, তখন সব সবজির চাইতে বড় এমন এক বৃক্ষ হয়ে যায়, যার ডালে পাখী এসে বাসা বাঁধে। (ইঞ্জীল ঃ মাত্তা) ইঞ্জীল মরকাসের ভাষা কোরআনের ভাষার অধিক নিকটবর্তী। তাতে আছেঃ সে বলল, আল্লাহ্র রাজত্ব এমন, যেমন কোন ব্যক্তি মাটিতে বীজ বপন করে এবং রাত্রিতে নিদ্রা যায় ও দিনে জাগ্রত থাকে। বীজটি এমনভাবে অংকুরিত হয় ও বেড়ে যায় যে, মনে হয় মাটি নিজেই বুঝি ফলদান করে। প্রথমে পাতা, এরপর শীষ, এরপর শীষে তৈরী দানা। অবশেষে যখন শস্য পেকে যায়, তখন সে অনতিবিলম্বে কাঁচি লাগায়। কেননা, কাটার সময় এসে গেছে।—(ইযহারুল-হক, ৩য় খণ্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা) আকাশের রাজত্ব বলে যে শেষ নবীর অভ্যুদয় বোঝানো হয়েছে, তা তওরাতের একাধিক জায়গা থেকে বোঝা যায়।

لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবায়ে কিরামকে উল্লিখিত গুণে

গুণান্বিত করেছেন এবং তাঁদেরকে দুর্বলতার পর শক্তি এবং সংখ্যাল্পতার পর সংখ্যাধিক্য দান করেছেন, যাতে এগুলো দেখে কাফিরদের অন্তর্জ্বালা হয় এবং তারা হিংসার অনলে দগ্ধ হয়। হযরত আবূ ওরওয়া যুবায়রী (র) বলেন ঃ একবার আমরা ইমাম মালিক (র)-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি কোন একজন সাহাবীকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কিছু বক্তব্য রাখল। তখন ইমাম মালিক (র) উপরোক্ত আয়াতটি পূর্ণ তিলাওয়াত করে যখন لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন বললেন ঃ যার অন্তরে কোন একজন সাহাবীর প্রতি ক্রোধ আছে, সে এই আয়াতের শাস্তি লাভ করবে।—(কুরতুবী) ইমাম মালিক (র) একথা বলেন নি যে, সে কাফির হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন যে, সে-ও এই শাস্তি লাভ করবে। উদ্দেশ্য এই যে, তার কাজটি কাফিরদের কাজের অনুরূপ হবে।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

مِنْهُمْ-এর مِنْ অব্যয়টি এখানে সবার মতে বর্ণনামূলক। অর্থ এই যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। এ থেকে প্রথমত জানা গেল যে, সব সাহাবায়ে কিরামই বিশ্বাস স্থাপন করতেন ও সৎকর্ম করতেন। দ্বিতীয়ত, তাঁদের সবাইকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। এই বর্ণনামূলক مِنْ-এর ব্যবহার কোরআনে প্রচুর ; যেমন فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ এখানে مِنَ الاوثان বলে رجس-এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে منهم বলে الذين امنوا-এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। রাফেযী সম্প্রদায় এ স্থলে مِنْ-কে 'কতক'-এর অর্থে ধরেছে এবং আয়াতের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছে যে, সাহাবীগণের মধ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী যাঁরা ঈমানদার ও সৎকর্মী, তাঁদেরকে এই ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। এটা পূর্বাপর বর্ণনা এবং পূর্ববর্তী আয়াত-সমূহের পরিষ্কার পরিপন্থী। কেননা, যে সব সাহাবী হুদায়বিয়ার সফর ও বায়'আতে-রিযওয়ানে শরীক ছিলেন, তাঁরা তো নিঃসন্দেহে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং আয়াতের প্রথম উদ্দিষ্ট। তাঁদের সবার সম্পর্কে পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সন্তুষ্টির এই ঘোষণা করে বলেছেন ঃ

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ—সন্তুষ্টির এই ঘোষণা নিশ্চয়তা দেয় যে, তাঁরা সবাই মৃত্যু পর্যন্ত ঈমান ও সৎ কর্মের উপর কায়েম থাকেন। কারণ, আল্লাহ্ আলিম ও খবীর তথা সর্বজ্ঞ। যদি কারও সম্পর্কে তাঁর জানা থাকে যে, সে ঈমান থেকে কোন-না-কোন সময় মুখ ফিরিয়ে নেবে, তবে তার প্রতি আল্লাহ্ স্বীয়

সন্তুষ্টি ঘোষণা করতে পারেন না। ইবনে আবদুল বার (র) ইস্তিয়াবের ভূমিকায় এই আয়াত উদ্ধৃত করে লিখেন ঃ ومن رضى الله عنه لم يسخط عليه ابدا অর্থাৎ আল্লাহ্ যার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, তার প্রতি এরপর কখনও অসন্তুষ্ট হন না। এই আয়াতের ভিত্তিতেই রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ বায়'আতে-রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ জাহান্নামে যাবে না। অতএব, তাঁদের জন্যই যখন মুখ্যত এই ওয়াদা করা হয়েছে, তখন তাদের মধ্যে কারও কারও বেলায় ব্যতিক্রম হওয়া নিশ্চিতই বাতিল। এ কারণেই সমগ্র উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, সাহাবায়ে কিরাম সবাই আদিল ও সিকাহ্।

সাহাবায়ে কিরাম সবাই জান্নাতী, তাঁদের পাপ মার্জনীয় এবং তাঁদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা গোনাহ্ ঃ কোরআন পাকের অনেক আয়াত এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ। তন্মধ্যে কতিপয় আয়াত এই সূরাতেই উল্লিখিত হয়েছে ঃ

الزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها এবং لقد رضى الله عن المؤمنين

এছাড়া আরও অনেক আয়াতে এই বিষয়বস্তু রয়েছে ঃ

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ - وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ -

সূরা হাদীদে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى

অর্থাৎ তাঁদের সবাইকে আল্লাহ্ 'হুসনা' তথা উত্তম পরিণতির ওয়াদা দিয়েছেন। এরপর সূরা আম্বিয়ায় হুসনা' সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ অর্থাৎ যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে পূর্বেই হুসনার ফয়সালা হয়ে গেছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم অর্থাৎ সমগ্র সময়কালের মধ্যে আমার সময়কাল উত্তম। এরপর সেই সময়কালের লোক উত্তম, যাদের সময়কাল আমার সময়কালের সংলগ্ন, এরপর তারা যারা তাদের সংলগ্ন। আরও এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমার সাহাবীগণকে মন্দ বলো না। কেননা, (ঈমানী শক্তির কারণে তাঁদের অবস্থা এই যে,) তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ ব্যয় করে, তবে তা তাঁদের ব্যয় করা এক মুদের সমানও হতে পারে না এমনকি অর্ধ মুদেরও

না। মুদ আরবের একটি ওজনের নাম, যা আমাদের অর্ধ সেরের কাছাকাছি।---(বুখারী)
হযরত জাবের (রা)-এর হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা সারা জাহানের মধ্য থেকে আমার সাহাবীগণকে পছন্দ করেছেন। এরপর আমার সাহাবীগণের মধ্য থেকে চারজনকে আমার জন্য পছন্দ করেছেন---আবূ বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রা)। ---(বাযযার) অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

الله الله فى اصحابى لا تتخذ وهم غرضا من بعدى فمن احبهم فبحبى احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانى ومن اذانى فقد اذى الله ومن اذى الله فيوشك ان ياخذه -

আমার সাহাবীগণের সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় কর, আল্লাহ্কে ভয় কর। আমার পর তাঁদেরকে নিন্দা ও দোষারোপের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করো না। কেননা, যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালবাসে, সে আমার ভালবাসার কারণে তাঁদেরকে ভালবাসে এবং যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে, সে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে। যে তাঁদেরকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয় এবং যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহ্কে কষ্ট দেয়। যে আল্লাহ্কে কষ্ট দেয়, তাকে অচিরেই আল্লাহ্ আযাবে গ্রেফতার করবেন।---(তিরমিযী)

আয়াত ও হাদীস এ সম্পর্কে অনেক। 'মকামে-সাহাবা' নামক গ্রন্থে আমি এগুলো সন্নিবেশ করেছি। সব সাহাবীই যে আদিল ও সিকাহ্---এ সম্পর্কে সমগ্র উম্মত একমত। সাহাবায়ে-কিরামের পারস্পরিক মতবিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা, সমালোচনা ও ঘাঁটাঘাঁটি করা অথবা চুপ থাকার বিষয়টিও এই গ্রন্থে বিস্তারিত লিখিত হয়েছে। প্রয়োজন মাফিক তার কিছু অংশ সূরা মুহাম্মদের তফসীরে স্থান পেয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে।